পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাসে দ্বন্দ্বময় বাস্তব : নতুন ব্যক্তি-পরিচয়ের সন্ধান

উপন্যাসের মর্মবস্তু সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে বিচিত্র জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। উপন্যাসের বিষয়, আঙ্গিক, আধুনিকতা ও বয়ন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের তত্ত্ব উপস্থাপিত হচ্ছে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন ধরণের দ্বন্দ্ব কিভাবে উপন্যাসের চরিত্রকে এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তি-মানুষের আকল্পকে আমূল বদলে দিচ্ছে - আজকের পাঠক উপন্যাসের মধ্যে সেই বিশ্লেষণই প্রত্যাশা করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ যে বাংলা উপন্যাসের কথকতার সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করেননি এবং বহিরঙ্গ ঘটনা-প্রবাহকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে মনোজগতে অন্তর্বৃত চেতনাপ্রবাহকে বিকল্প বিবরণ রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন - এই তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। একদিকে ঔপনিবেশিক সমাজের ক্রমশ জটিল হয়ে-ওঠা সমাজবৃত্ত এবং অন্যদিকে অননুয়-পীড়িত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী - বাস্তবতার এই পরিসর ঔপন্যাসিক কল্পনার পরিধিকে খুব বেশি বিস্তৃত হতে দেয়নি। উপন্যাসের আখ্যানকে ব্যাপ্ত না করে ঔপন্যাসিক অনুভূতি আর উপলব্ধির ইতিহাস দিয়ে সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে বয়ন করেছেন। কাহিনীর প্রচলিত অনুপুঙ্খকে ক্রমাগত খর্ব করতে করতে ব্যক্তির অনুভব-কেন্দ্রিক পুরোপুরি নতুন চরিত্রের আখ্যান ঔপন্যাসিক যেন নির্মাণ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ধূর্জটিপ্রসাদ উপন্যাসের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রকে প্রত্যাখ্যান করে ব্যক্তির চেতনা-নির্ভর এক নতুন ধরণের উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন যেখানে সমাজবাস্তবতা শুধু বহিরঙ্গ উপস্থিতি নিয়ে থাকে না, মনোজগতে গৃহীত হয়ে মুখ্যত অন্তর্বৃত উপস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তির সামাজিক সত্তা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় না, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিত উপস্থিতি ব্যক্তির স্বরূপ এবং উত্থান-পতনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস ত্রয়ীতে তাঁর সমাজ-বাস্তবতাপ্রসূত বিশ্ববীক্ষাই নিয়ন্তার ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং এই জন্য

তাঁর উপন্যাসের মানবসত্তা সমাজ-বাস্তবতার ব্যঞ্জনাময় পরিধির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এই জন্যই ধূর্জটিপ্রসাদের বাস্তবতাবোধ, জীবনদর্শন, ব্যক্তি-স্বরূপ-বিষয়ক-বিশ্বাস, বিশিষ্ট রচনাশৈলী - একই শিল্পসত্তের অভিব্যক্তি। এখানে গিয়র্গ লুকাচের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য -

> "It is the view of the world, the ideology or Weltanschauung underlying a writer's work, that counts. And it is the writer's attempt to reproduce this view of the world which constitues his 'intention' and is the formative principle underlying the style of a given piece of writing. Looked at in this way, style ceases to be a formalistic category. Rather, it is rooted in content; it is the specific form of a specific content." [১]

উপন্যাসে চিত্রিত ব্যক্তি সবসময়ই প্রসঙ্গ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁর মানবসত্তা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি-স্বরূপ কখনো উপন্যাসের নির্দিষ্ট পরিধি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ধূর্জটি-প্রসাদ সময় ও সমাজের যে বিশেষ পরিসরে তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী রচনা করেছেন, তাতে ব্যক্তি সমাজ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত, এই বিচ্ছিন্নতার দহন ও পরিত্রাণ-সন্ধান একই সঙ্গে সক্রিয় ছিলো বলে উপন্যাসের আখ্যানে বুদ্ধিবাদ আশ্রয়ভূমি না হয়ে ব্যক্তি-র নিরালম্ব অবস্থানকেই আরো প্রকট করে দিয়েছিলো।

এতে সন্দেহ নেই যে

> "সমকালের সমস্যা-জর্জরিত, সংমুগ্ধ জীবনপ্রবাহ থেকেই উপন্যাসিক জীবনের শিল্পরূপ দান করেন। সমকালের রাজনীতি-ধর্মনীতির দ্বন্দ্ব, আর্থিক সমস্যা, প্রেমচিন্তা, আদর্শ ও বাস্তবের অন্তর্বিরোধ সবই উপন্যাসের অন্তর্গত।" [২]

এই সবকিছুর মূলে রয়েছে ব্যক্তি সম্বন্ধে নতুন ভাবনা আর এই ভাবনা স্পষ্টতই নতুন

বাস্তবতাবোধেরই ফসল। উপন্যাসের প্রধান উপাদান হলো ব্যক্তি এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দান ও জটিলতাপূর্ণ মানব-মনের স্বরূপ উদ্ঘাটন। প্রচলিত অর্থে আমরা বাইরের দৃশ্যমান জগতের মধ্যে ব্যক্ত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে বাস্তবতা বলি; কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতা তুলনামূলকভাবে খানিকটা ভিন্ন ধরণের। সমাজবদ্ধ মানুষের দুটি সত্তা বর্তমান - একদিকে সে সমাজের একক, অপরদিকে নিজের পরিসরে সে সার্বভৌম। তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-প্রবণতা অন্যের থেকে আলাদা। এই দ্বৈত সত্তার জন্য ব্যক্তি যেমন সমাজের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত, তেমনি নিজের মধ্যেও সম্ভব-অসম্ভব, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে জর্জরিত, তাহলে বলা যায় যে সংঘাত কেবলমাত্র বস্তুজগতের প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তির অন্তর্জগতেও এই সংঘাত বর্তমান। স্বভাবত স্বাধীন চিন্তা-শীল মানুষের জীবন যেমন নানা জটিলতায় জর্জরিত, তেমনি তার কাজকর্মও বিচিত্র ধরণের। এই বৈচিত্র্যের জন্যে বাহ্যিক, মানসিক, জৈবিক-সবরকমের চিন্তা ভাবনাই সাহিত্যের বাস্তবতায় গ্রহণীয়। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর দৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে ফুটে উঠে। কোনো ঔপন্যাসিক মানুষের বহিরঙ্গ দিকের প্রকাশ ঘটান আবার কেউবা চরিত্রের অন্তর্বৃত বুনট ও মানসিকতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। কেউ বা হয়তো মানুষের জৈবিক পরিচয়কে বড়ো করে তোলেন। যেহেতু মানবজীবন সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ এই দু'য়ের দ্বান্দ্বিকতায় গঠিত, তাই কেবল জীবনের আপাত-সুন্দর দিকের বর্ণনা আংশিক সত্যের প্রকাশ মাত্র, তাতে সমগ্র জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ সমগ্র জীবনের দ্বন্দ্বময় অভিব্যক্তিই উপন্যাসের অন্বিষ্ট। সমাজবদ্ধ ব্যক্তির জটিল জীবন-প্রতীতির সার্থক শিল্পরূপ সন্ধান করার জন্যেই ঔপন্যাসিক বিষয়, আঙ্গিক, বয়ন, চরিত্রচিত্রণের প্রচলিত রীতিতে কখনো সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকতে পারেননা। তাই বলা হয়,

> "The Novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual against society."[৩]

ব্যক্তি ও সমাজের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার শিল্পরূপ দানই বাস্তববাদী উপন্যাসিকের অভীষ্ট। এ-ব্যাপারে বাস্তববাদের জনৈক প্রবক্তা বলেছেন -

> "The truth of an age may be expressed only by him - who has a clear idea of the as-pirations and aims of that age. The task of the artist and his problem, is to show not the accidental and particular, but the essence, the purpose and the ruling tendencies of his time."[৪]

উপন্যাস সময়ের দর্পন তাই তাতে সমকালীন জীবনদর্শন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, সমাজ ও ব্যক্তির আতি প্রকট হয়ে ওঠে। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ী এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নয়; আবার, নিয়ত মনন-চর্চায় নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীর রচনা হিসেবে তাতে এদের স্বাতন্ত্র্যও অনস্বীকার্য।

ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য কোথায় কতটা রক্ষিত হয়েছে এবং সেই দ্বন্দ্বের পরিণতি কীভাবে চিত্রিত হয়েছে তারই প্রেক্ষাপটে আমরা আলোচ্য বিষয়কে উপস্থাপিত করছি।

ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাস রীতি ও প্রকরণের দিক থেকে এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে। তথ্য-নিষ্ঠ বিজ্ঞান-ভিত্তিক মননধর্মের এক নতুন দিকের প্রতিনিধি রূপে এরা গণ্য। আধুনিক মনস্তত্ত্ব-মূলক উপন্যাসে প্লট বা চরিত্র-চিত্রন মুখ্য নয়, একজন ব্যক্তির মানসিক তরঙ্গভঙ্গের বর্ণনা দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা' - এই ত্রয়ী উপন্যাসে নায়ক চরিত্র হলেন খগেনবাবু। তাঁর অন্তর্জগতের চিত্র পরিস্ফুট করাই এই উপন্যাস ত্রয়ীর উদ্দেশ্য। খগেনবাবুর বুদ্ধি ও মনীষার টানাপোড়েনজনিত যন্ত্রনাই

লেখক চিত্রিত করেছেন। আবর্ত উপন্যাসে এই বিরোধের প্রকাশ, 'অন্তঃশীলা'-তে তার বেগবান যুক্তি এবং 'মোহানা'তে উত্তরণ। সমাজ ও ব্যক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের বিভিন্ন স্তর এবং স্তর-পরম্পরার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত অগ্রগমন এবং শেষ পর্যন্ত সমন্বয়বিন্দুতে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিই ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসত্রয়ীতে ব্যক্ত হয়েছে। এই পদ্ধতি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের এই বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে যে, ব্যক্তিমনে এ যুগের সমস্ত মূল্যবোধ আভাসিত এবং সমন্বিত হবে। খগেনবাবু বাস্তবজগৎ ও ভাবের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি। সাধারণ মানুষ এবং উচ্চবিত্তের নীতিহীনতা, কৃত্রিমতা ও ধর্মীয় ভণ্ডামির পরিবেশে খগেনবাবু একাত্মতার অবকাশ খুঁজে পাননা। আবার স্রোতের মধ্যেও নিজেকে ভাসিয়ে দিতে তিনি অপারগ। অন্যদিকে সাধারণের সঙ্গে মেলামেশাতেও তার রুচি হয় না, এরকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় স্ত্রী সাবিত্রীর আত্মহত্যায় খগেনবাবু নিজেকে বড়ো অসহায় মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীর বান্ধবী রমলাদেবীর সঙ্গে তার পরিচয় নিবিড় হতে থাকে। ফ্যাসনপ্রিয় রমলাদেবীও খগেনবাবুকে নানা ভাবে আকৃষ্ট করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে নিরেট মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফলে দেখা গেলো নিঃসঙ্গতা, স্ত্রী-পুরুষের অসমতা, রাজনৈতিক জগতে অসন্তোষ, মধ্যবিত্ত সমাজের ভণ্ডামি, নারী-পুরুষ সবাই যেন বাইরের জৌলুষ নিয়ে ব্যস্ত।

খগেনবাবু ভাবের রাজ্য থেকে পালাবার একমাত্র পথ খুঁজেছেন সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে; এভাবেই তিনি ব্যষ্টি থেকে ব্যক্তির স্তরে পৌঁছতে চেয়েছেন। অন্যদিকে বিজনের মতো উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানের পক্ষে যেমন সাম্যবাদী আন্দোলনে যোগ দেওয়া অবাস্তব তেমনি পরিণতিতে টেনিস খেলতে যাওয়ার বিষয়টিও অল্পকথায় জীবনসত্যকে উদ্ঘাটন করে। ধূর্জটিপ্রসাদ আসলে মধ্যবিত্ত-নির্ভর সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্তর-দুর্বলতা

সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করতে চেয়েছেন। বিজন সাম্যবাদী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলনের সময় নেতৃত্বের অন্যায় চোখে পড়ায় রমলাদেবীর সাহচর্যে সে বিরোধী শিবিরে যোগ দিতে চায়। এতেও সাম্যবাদী আন্দোলনের সুবিরোধিতাক্লিষ্ট ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে এও সত্য যে বিজনরাই তো শেষ কথা নয়, সাময়িক ভুল হলেও মার্কসবাদই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নরক থেকে মানব-সভ্যতাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিনে পৌঁছে দিতে পারে - অন্যত্র লেখক এ-বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আমরা বিজন ও সফীককে জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকতে দেখি। তত্ত্ব ও প্রয়োগের পার্থক্য যে আত্মখণ্ডন-জনিত শোচনীয় অপচয়ের কারণ, ধূর্জটিপ্রসাদ সেই সত্যই প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ সমাজবাস্তবতা থেকে যখন ঔপন্যাসিক উপাদান সংগ্রহ করেন তখন দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি-বিশ্লাস্য হয়ে ওঠে। বস্তুত সৃষ্টির সার্থকতার সূত্র এখানেই নিহিত।

মার্কসবাদের প্রায়োগিক প্রয়োগ সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের সংশয় থাকলেও মানুষের মৌল চলিষ্ণু সত্তা সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিলো না। তার বিষয়ত্রিয়া সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। অবহেলিত দরিদ্র জনসাধারণ তাঁর রচনায় বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই কারণেই তাঁর মধ্যে একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা দেখা যায়। তিনি নিজেকে 'মার্কসোলজিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসারকে শুভ ইঙ্গিত হিসেবে প্রশংসাও করেছেন। হিরণকুমার সান্যাল জানিয়েছেন -

> "পরিচয়-এর পাতায় লালের আভা আর একটু গাঢ় হল। কিন্তু এই রঙ্ প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে।" [৫]

বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের চিন্তাচেতনা লিপিবদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র সঙ্গে তুলনা করে ডিউই, ড্রাইজার ও বার্নার্ডশের সোভিয়েত-বিষয়ক তিনখানি পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন -

"ভারতবর্ষে কমিউনিজম সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তর জ্যোতিষী দিতে পারেন, অন্যে পারে না। তবে রাশিয়া সম্বন্ধে কোন ভাল বই পড়লে মনে হয় 'দিন আগত ঐ ভারত তবু কৈ ?" [৬]

তাঁর মধ্যে এই দ্বৈত সত্তা সর্বদাই ক্রিয়াশীল, এই দ্বৈততা সুপ্তময় আকাঙ্ক্ষা ও সুপ্তভঙ্গ-জনিত নৈরাশ্যবিধুর যন্ত্রণার। ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদীদের আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। 'সামন্ততন্ত্র' ও 'ধনতন্ত্র' - শব্দদুটি ব্যবহার সম্পর্কেও তাঁর দ্বিমত লক্ষণীয়। তাঁর মতে সমস্ত বাস্তব-ঘটনা-প্রবাহ যদি মার্কসবাদের ছকে ফেলে দেখা যেত তবে ভালো হতো, কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে তিনি এর থেকে দূরে থাকতেই নির্দেশ দেন। এতে বুদ্ধিজীবী-সুলভ দোলাচল ও সংশয়ই তাঁর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। 'পার্সোনালিটি এ্যান্ড সোসাল সাইন্স' -গ্রন্থে শ্রেণী সংগ্রামের যে তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছেন তা পরবর্তী রচনাবলীতেও ছায়াপাত করেছে। শ্রেণীসচেতনতার তত্ত্বকে ইতিহাসের বিকৃত ফল বলে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তাকেই সারাজীবন ধরে বহন করে গেছেন। স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় - কেন তিনি একদিকে দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি সমব্যথী আবার অন্যদিকে তাদের বেঁচে থাকবার সংগ্রামকে সমর্থন জানান ? এই দ্বিধা ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর সীমাবদ্ধ অবস্থানকেই চিনিয়ে দেয়। রাজনীতিবিদ্‌দের অনাচারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করেন। আর এতেই তাঁর শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ঝিলিমিলি'তে তিনি লিখেছেন -

"আমি পোলিটিক্যাল জীব নই, কেবল ভালো ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চাই।" [৭]

ধূর্জটিপ্রসাদের এই মন্তব্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর জীবনদর্শনে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতাই ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্লেষণী বুদ্ধির প্রখরতা যেমন

তাঁদের অস্তিত্বে গোত্র-চিহ্ন, তেমনি একইসঙ্গে অস্থির সমাজের অধিবাসী হিসেবে নিরাপত্তা-হীনতা যেহেতু তাঁদের উপলব্ধিকে আক্রমণ করে, বিচ্ছিন্নতাই তাঁদের স্বাভাবিক নিয়তি। শুধু তাই নয় এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে তাত্ত্বিক সমর্থন বুদ্ধিজীবীরা অনবরত যোগান দিয়ে যান। এই শতাব্দীর বিখ্যাত মার্ক্সীয় চিন্তাবিদ আন্তোনিওগ্রামশি সমাজে বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাংস্কৃতিক চিন্তা-পদ্ধতির যে পুনর্বিন্যাসের কথা বলেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে যেন তারই ছায়া আমরা লক্ষ করি। উপন্যাসে এবং উপন্যাস-বহির্ভূত গদ্যসাহিত্যে বুদ্ধিজীবীদের সার্বভৌম অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযোগী পাঠকৃতি বা Discourse ধূর্জটিপ্রসাদ এভাবেই প্রস্তুত করেন। এই মৌল জীবনাদর্শের যথার্থ বিন্যাস করার প্রয়োজনেই তিনি অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সংগীততত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র মানবিক উপলব্ধির আয়তন থেকে আন্তঃসাংস্কৃতিক বয়ানের (Intertextulality) উপকরণ আহরণ করেছেন। আবার নাগরিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে দ্বন্দ্বমথিত সামাজিক প্রেক্ষিত থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চান - এটাও অনিবার্য যেহেতু সমাজ সংগঠনের ভিত্তিমূলের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী বর্গ নিঃসম্পর্কিত। গ্রামশি বলেছেন -

> "বুদ্ধিজীবীরা এক ধরণের 'গোষ্ঠীবোধ' থেকে তাঁদের অব্যাহত ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়তা এবং তাঁদের বিশেষ যোগ্যতার বিশিষ্টতা অনুধাবন করেন, তাই তারই জোরে তাঁরা প্রধান সামাজিক শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলে নিজেদের পরিচয় দেন। এই স্বমূল্যায়নের পরিণাম দেখা যায় মতাদর্শ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে।" [৮]

একটু আগে আমরা ধূর্জটিপ্রসাদের পাঠকৃতিতে যে আন্তঃ সাংস্কৃতিক বয়ানের প্রয়াস লক্ষ করেছি, তার মধ্যে স্ববিরোধিতা-জনিত উচ্চাবচতার অভাব নেই, সঙ্গীত তার মতে জীবন-চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ ('integral part of living') এবং এই জন্যে

উপন্যাসের গঠনরীতির মধ্যেও তিনি সাংগীতিক কাঠামোর অনুসৃতি লক্ষ করেছেন। ধূর্জটি-প্রসাদের উপন্যাস ত্রয়ী আসলে উপন্যাসতত্ত্ববিষয়ক উপন্যাস, সেই সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে জীবনতত্ত্ব, সাহিত্য-তত্ত্ব, মানবিক সম্পর্ক বিষয়কতত্ত্ব অর্থাৎ সব মিলিয়ে এমন একটি ঔপন্যাসিক সন্দর্ভ যেখানে মানবিক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন বিচিত্র অভিব্যক্তির উপকরণ হিসেবে গ্রাহ্য হয়। তবে এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে প্রধান ও অপ্রধানের ভেদ লেখক স্বীকার করেন এবং অপ্রধানের প্রয়োজনীয়তা জীবনে ও শিল্পে স্পষ্ট করে তোলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সৃজনশীল সত্তাকে যদি ভালো ভাবে বুঝতে চাই, তাহলে উপন্যাসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো বক্তব্য ও চিন্তার সূত্রকে অনুধাবন করতে হবে। সব মিলিয়ে তাঁর উপন্যাসে আন্তঃসাংস্কৃতিক বয়নের মধ্যে সংগীতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কেননা সংগীতের আকল্পকে তিনি উপন্যাসের অন্তর্বৃত্ত-বহির্বৃত্ত নির্মিতির ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকায় স্থাপন করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা অন্তঃশীলার বয়ন থেকে কিছু কিছু চিন্তাসূত্র উদ্ধৃত করছি -

ক) "মনের ওপর ভাষার আধিপত্য না সরালে সংগীতের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। অথচ সেই কথিত ভাষা ভিন্ন অন্য কি উপায় আছে বোঝাবার ? ... বাক্যে সব ধরা পড়ে না - এবং সত্তা এবং প্রকাশ এক বস্তু নয়। অনেকটা আইস্‌-বার্গের মতন, ভাষা কেবল ওপরের ভাসমান ও দৃশ্যমান অংশটুকু। চারভাগের তিনভাগ থাকে নেপথ্যে। তাকে প্রকাশ করতে হয় সমগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে। সমগ্র এই কারণে যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে তৎসদৃশ ভাষাতিরিক্ত অবচেতনা ও উর্ধ্বচেতনা রয়েছে। ... গানই বলুন, মানুষই বলুন, আর সাহিত্যই বলুন, শুদ্ধ-ভাবে গতি ও রূপটা লক্ষ্য করতে হয়, তারপর ব্যবহার যা হয় হোক পরে, পূর্বে নয়। পূর্বের ব্যবহার কেবল অভ্যাস, সংস্কার, পুঁথিপড়া মুখস্ত বিদ্যা। শুদ্ধভাবে দেখার অর্থ - বস্তুর সত্তা বোঝা - যেটি যা ঠিক তাইটি বোঝা - বোঝা নিজের সমগ্রতা দিয়ে। তাহলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপায় ঠিক করে নেবে।"[১]

খ). "ভাবতাম - আমি যেকালে বিচিত্র, আমার অভিজ্ঞতা যেকালে পর পর চলে আসছে, তখন সে বৈচিত্র্যের একটা মূলগত ঐক্য ও সূত্র থাকবেই থাকবে। অভিজ্ঞতার অন্তরে কিছু পাইনি বোধ হয়, তবু বুদ্ধির দ্বারা একটা ঐক্য সৃষ্টি করতে, একটি মালা সাজাতে গিয়েছি। অন্তরের সূত্র খুঁজে পাইনি, তাই বিশ্বাস ক'রে এসেছি বুদ্ধির সূত্রে।" [১০]

গ) "আমার জীবনের ক্ষণগুলি রঙ্গমঞ্চের নর্তকীর মত লঘুপদে নাচে, ফ্যাকাসে তাদের রং, পাউডার মাখা তাদের মুখ, রাত্রি জাগরণে, অত্যাচারে, চিত্ত-শূন্যতায় তাদের চোখের কোনে কালিমা পড়েছে, কৃত্রিম তাদের আভা, তাদের নিজত্ব নেই, নৃত্যশিক্ষকের আদেশ অনুসারে ছক তৈরী করাই তাদের চরম সার্থকতা। এই আকস্মিকের ছক তৈরী করার নামই জীবন, আমার জীবন। তার মধ্যে রূপের ঐক্য নেই, মালার সাতত্য নেই, সুরের অবিচ্ছিন্নতা নেই।" [১১]

ঘ) "আর্টে কি হয় ? নভেলে একটা মূলসূত্র, এবং তারই চারপাশে অনেক ছেঁড়া সুতো থাকে। কিন্তু প্রধান অংশের চারপাশে থেকেই তাদের সার্থকতা। আধুনিক নাটকেও তাই - অবশ্য আগেকার নাটকে ছেঁড়া সুতোর স্থান ছিল না। কারণ জীবন তখন অত বিচিত্র হয়ে ওঠে নি। আমাদের সংগীতেও তাই। ... মূল থীমের চারপাশে ছোট ছোট Phrase ঘোরে ফেরে। আগে প্রধান অ-প্রধানের মধ্যেকার সম্বন্ধ ছিল ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, রাজা-প্রজার মত স্থির ও পূর্ব হতেই নিয়ন্ত্রিত, তারই নাম Unity of action. কিন্তু এ যুগের জীবন বিচিত্র, সমৃদ্ধ, তাই Unity-র আজ কোন খাতির নেই। Counter point -এর মত প্রধান অ-প্রধান জুড়ে যেতে পারে, এখানকার আর্টে সুতো জড়িয়ে গেলে সর্বনাশ হয় না, সমালোচকও

বিচলিত হন না। সবটা মিলে একটা অখন্ড কিছু উপভোগ্য হলেই হল, যেমন Joyce -এর Ulysses -এ হয়েছে।" ১২

৬) "আধারের দিক থেকে তাৎপর্য বুঝতে হয়। লিখনভঙ্গির সাহায্যে ক্ষুদ্র আধার কিংবা উপহাস বৃহৎ তত্ত্ব বহন করতে পারে। অবশ্য আধারটির এবং উপহাসটির double reflection দেবার ক্ষমতা দেখান চাই। ছোট বড়র এই সম্বন্ধ, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের এই সমাবেশ স্থাপিত ও সাধিত হতে পারে তখনই যখন লেখক ঘটনা পারম্পর্যের বাইরে দাঁড়াতে পারেন। সাধারণ মানুষের কাছে বর্তমান বড়ই পিছিল, দোটানার মধ্যে পড়লে স্থির বুদ্ধি রাখা বড়ই মুস্কিল। আর্টিস্টের নিরাগ্রহ অবস্থা সাধনালব্ধ।" ১৩

চ) "কালের পারম্পর্য ভেঙে নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অন্য উপায় খুঁজে পেলাম স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকে। বুঝলাম সময়ের হার এক নয়, হৃদয় এক নয়, কখনও সময় চলে দ্রুত পদক্ষেপে, কখনও ধীরে, কখনও গতি তার রুদ্ধ। গতির হার বাড়ায় কমায় ভাবগুচ্ছ, আগ্রহ ঔৎসুক্য, ... ভাবগুচ্ছ সময়ের নতুন সংখ্যা, unit তৈরি করে।" ১৪

এই সব উদ্ধৃতি থেকে পাঠকের এই ধারণাই হয় যে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর উপন্যাস ত্রয়ীতে বিষয়ভাবনা ও গঠনরীতির ক্ষেত্রে সময় ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব দর্শনেরই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সাংগীতিক কাঠামোয় তিনি যে প্রধান - অপ্রধান কিংবা Point-Counter Point -এর গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন - তারই আদলে 'আবর্ত' এবং 'মোহানা'য় উপন্যাসের সন্দর্ভ নির্মাণ করেছেন। বিজন, সুজন, মাসিমা কিংবা সফিক, করিম, কিষণচাঁদ প্রমুখ খগেনবাবুর চিন্তাশীল অস্তিত্বের সার্বিক

পরিস্ফুটনের জন্যই প্রয়োজনীয়। প্রতিস্রোত রচনার মধ্য দিয়ে যেন স্রোতের চরিত্র নির্ধারণ করতে চেয়েছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। মানবিক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতাও তিনি একই ভাবে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। আবার অন্যদিকে খগেনবাবু ও রমলার সম্পর্কের তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের মধ্যে অনুপস্থিত অনুঘটক হিসাবে সক্রিয় থাকে সাবিত্রী এবং কখনো বা সুজন। পাশাপাশি ধূর্জটিপ্রসাদ কৌশলে সংশয় ও আত্মবিরোধিতাকে জীবনতত্ত্ব হিসেবে উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছেন। 'আবর্ত' উপন্যাস থেকে আমরা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি অংশ উদ্ধৃত করছি যাতে ধূর্জটিপ্রসাদের ভাবাদর্শগত অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

"খগেনবাবুকে বিজনের ভাল লাগে না যে তার কারণ বিজন এখনও নিম্ন-স্তরের। সময়ের, স্বভাবের নয়। অপরিণত যে ব্যক্তি সে কখনও পরিণতির পন্থার দুর্গমতা কল্পনা করতে পারে না, সংশয়ীর বিরোধকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অথচ সংশয়, বিরোধ, এই জীবন। সকলকেই খগেনবাবুর রাস্তার পথিক হতে হবে। এই হোলো মানবের আদিম অভিশাপ। মানুষকে সভ্য হতেই হবে। সভ্যতা বর্ণায় দ্বিধা, তাকে পাশ কাটিয়ে চলবে কে ? ... নীলকণ্ঠ না হয়ে বাঁচা যায় না। সুজনের নিজের মনে আগে একটা সামঞ্জস্য ছিল, এখন যেন বিচ্যুতি ঘটেছে। বিজন এত অল্প বয়সে, আত্মসন্ধানী হবার পূর্বেই, তার প্রয়োজন ঘটবার আগেই কেন সোশিয়ালিস্ট হোলো ? এ যেন বাঙালী-মেয়েদের কালচার, দ্বিতীয় ভাগের পরই রবীন্দ্রনাথ। ইজমে বিশ্বাস পরাশ্রয়ের পরকাষ্ঠা। ... মনে মনে যারা স্নব, যারা সমাজের উর্ধ্বতম শিখরে আরোহণ করতে চায়, তারা যখন ভাবে অর্থ নেই বলেই পাচ্ছে না তখনই তারা পরাভবের ব্যাখ্যা করতে সাম্যবাদের আশ্রয় নেয়।" [১৫]

উপন্যাস ত্রয়ীর বিভিন্ন চরিত্র প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন অস্তিত্বের অবভাস মাত্র তৈরি করে কারণ এরা প্রত্যেকেই ঔপন্যাসিকের জীবনতত্ত্বের প্রতিনিধি এবং প্রচারক। তাই স্বামী-স্ত্রী কিংবা নরনারীর সম্পর্ক-বিষয়ক যে তত্ত্ব খগেনবাবু ও সাবিত্রীর কিংবা খগেনবাবু ও রমলার মধ্যে ব্যক্ত হয় - সুজন বিজনও একই বিষয়ে কথা বলে। ধূর্জটিপ্রসাদের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি যে আদর্শহীন নিরালোকের প্রস্তাবনা নিয়ে আসে, তারই প্রকাশ ঘটে সুজনের প্রতি বিজনের উক্তিতে -

"তোমাদের প্রেম-স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, ও-সব বুর্জোয়া। কোথায় স্বামী-স্ত্রী সুখে ঘরকন্না করছে, দেখেছ ? কেন সকলে অসুখী জান ? এ বলে "তুমি আমার", ও বলে "তুমি আমার"। বেশ মিষ্ট লাগে, কবিতা লেখা চলে। কিন্তু তার মানে কি ? মানে, তুমি আমার ঝি, আর না হয় তুমি আমার খানসামা বেয়ারা, চাকর-প্রভুর সম্বন্ধকে গিলটি করে সোনা বলে কতদিন চালাবে ? আগে দোঁহা হুঁহুঁ, তার পরে হাহা-হুহু, এ ওকে গিলছে, ও তাকে গিলছে'।"[১৬]

বিজন সম্পর্কে রমলাকে সুজন যে খানিকটা লঘু ভঙ্গিতে বলে -

"স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে পুনর্গঠিত করার দুরভিসন্ধিও গোপনে সে পোষণ করছে।"[১৭]

এটা আসলে উপন্যাস ত্রয়ীতে ধূর্জটিপ্রসাদেরই মৌল অভিপ্রায়। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্তের সোশিও-লিজম চর্চা সম্পর্কে ব্যঙ্গপ্রবণ সন্দর্ভ ও ঔপন্যাসিক তৈরি করেছেন। এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের বয়ন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও বিশ্বাস। প্রাসঙ্গিক ভাবেই তিনি জানিয়েছেন -

ক) "তার চেয়ে ভাল এক টুকরো অভিজ্ঞতা, অখণ্ড তার অস্তিত্ব, জ্ঞান, অনুভব, আশা সকলকে গ্রন্থিত করে একটি তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্নতা।"[১৮]

খ) "অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। ... সব ক'টা অভিজ্ঞতা যোগ করলেও সব সময় একটি পূর্ণ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব ত ধরা পড়ে না। অন্য একটা কিছু চাই যার জোড়ে সমহিম হয়ে তাদের স্বরূপ ধরা দেবে।" [১৯]

গ) "মোদ্দা কথাটা ভুললে চলবে না যে পূর্বের সঙ্গে পরের, অন্তরের সঙ্গে বাইরের বিরোধই সকল গতির বেগ।" [২০]

ঘ) " ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সীমা পার না হলে মিথ্যা-শক্তির মোহ কাটে না, প্রকৃত শক্তির মোহ কাটে না, প্রকৃত শক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। একের মধ্যে সব শক্তি পুঁজি করা নেই সৃজন, আবার বাইরের বহুর মধ্যেও নেই, তারা ত জড় - এই দুই-এর মিলনে আছে। অন্যকে না পেলে আমি পূর্ণ হব কেমন করে ! ফ্রয়েডও মার্কসের সমন্বয় চাই।" [২১]

'মোহানা' উপন্যাসে ধূর্জটিপ্রসাদ আর নতুন কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি, তবে রাজনৈতিক আন্দোলনের Discourse -কে প্রাধান্য দিয়ে যেন অপ্রধানের মাধ্যমে প্রধান বয়ন-কাঠামোকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। খগেনবাবু ও রমলার সম্পর্কে তখন নতুন বস্তুগত যাত্রা যুক্ত হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে দেখা গেছে অবরোহনের সংকেত। উপন্যাস ত্রয়ীর ধরন্ন অনুযায়ী 'মোহানা'র সমাপ্তি প্রথাগত হয় নি, আপাতদৃষ্টিতে চেতনা-প্রবাহ যেন অবসিত, বাস্তবের বহির্বৃত ভূমিতে লেখক এসে দাঁড়িয়েছেন। উপন্যাসে প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে খুঁজে বেরিয়েছে পরিপূর্ণতাকে কিন্তু মানুষের সত্তায় অন্তর্লীন শূন্যতা দুরতিক্রম্যই রয়ে যায়। জীবনতত্ত্বের মূলাধার যে জন্মাগত বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব, ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতিকল্প চরিত্র খগেনবাবুর মধ্যে শেষ পর্যন্ত তাই প্রকাশিত হয়।

"একলা বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না। অথচ সেদিন পর্যন্ত নিরালায় সাধনাই কাম্য। ... এ যেন একটি স্বরূপ সিম্ফির ক্রমিক পর্যায়। বিপরীত বোধের জন্ম হল, দেহ-চর্চায় এবং শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে সেটা বৃদ্ধি পেল। আজ রমলা মরে গেছে, আন্দোলনের প্রাণ নেই, ধাক্কা খেয়ে যে-কে -সেই। ... মায়ের আদুরে ছেলে, সে আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, তাও এই দেশের, তার ওপর শিক্ষিত, সঙ্গে ধর্মজ্ঞান, মিলেমিশে প্রীগ্। এই প্রীগ্মনকে চোখ ধারতে ওস্তাদ, হাজার যুক্তি, লম্ফ জম্ফুরি দিয়ে। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় আত্মবলি, কালো পাথরের ওপর রক্তপাত, নির্মম কুঠারাঘাতে, পাথরের কুড়ুলে।" [২২]

যে সংগীতের কাঠামো উপন্যাস ত্রয়ীর গঠনরীতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে, তারই পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে যে খগেনবাবু-কেন্দ্রিক প্রধান সুরের বিস্তার শেষ পর্যন্ত সমে পৌঁছালো না। ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনতত্ত্ব অনুযায়ী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র সংশয়ের দোলায় আন্দোলিত হয়ে থাকেন, কেননা তাঁর কোনো স্থির বিশ্বাসের কেন্দ্র নেই। তাই নায়ের মধ্যে স্রোতের মোহানাতে পৌঁছানোর যে ইঙ্গিতই থাক, প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস ত্রয়ীতে অভিব্যক্ত মানুষমানুষী জীবন-প্রবাহের সূচনাহীন এবং সমাপ্তি-বিহীন। তৃতীয় পর্বের উপন্যাসের প্রায় শুরুতেই খগেনবাবুর বোধোদয় হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের অতিক্ষীণ ঘটনাবৃত্তও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে এই উপন্যাসের মধ্যে ক্রমবিকাশের কোনো সম্ভাবনাই থাকে নি। খগেনবাবু রমলাকে যা বলেন তাতেই ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনতত্ত্বের চক্রটি পূর্ণ আবর্তন করে আসে -

"সকলেরই জীবনে একটা মুহূর্ত আসে যখন সহজ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে চোখে পড়ে। তখনই আতঙ্ক হয় বুঝি বা মাথার ওপরকার আকাশটাই খান্ খান্ হয়ে ভেঙে ঘাড়ে পড়ল। কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়

যে যাকে আঁকড়ে ধরে ছিলাম সেটা ছিল নিজেরই কামনা মাত্র। বিশ্বাসের প্রকৃতি হল ইচ্ছাপূরণ। আমাদের ইচ্ছাগুলোও আবার ভীষণ কাঁচা, আকাশের দোষ কী।" ২৩

এর পাশাপাশি আমরা লক্ষ করি যে আখ্যানের সূত্রধার হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর রচনারীতির মূল অবলম্বন অর্থাৎ চেতনাপ্রবাহরীতির অন্তর্গত দার্শনিক সত্যকে ব্যক্ত করেছেন - আর এখানেই তাঁর জীবনাদর্শ ও শিল্পতত্ত্ব অর্ধনারীশ্বরের মতো পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে -

"দিনের আলোয় ঘটনাগুলো চিক্ চিক্ করে, সুখদুঃখের ভেদাভেদ হ্রাস হয়, তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয় না। দুঃখের রূপ যদি ফার্সি বয়েতের মতন হ'ত তবে আর ভাবনা ছিল না। সুখের ঢঙ যদি ঠুংরীর তানের মতন হত, তবে ভাবের বদলে ভাও-বাতলানতেই কাজ চলত। বুদ্‌বুদ্ না হয় রঙিন, কিন্তু তারা ভাসে বর্ণহীন জলরাশির ওপর, জল ও বাইরে নিথর, যে স্তরে আলো প্রবেশ করল না সেখানে সে একটানা, তাই বুঝি বা স্রোতের রঙ কালো। গতি রুদ্ধ হলে রঙিন, নচেৎ আদিম অবিচ্ছিন্ন একরোখা বেগ মসীযাখা।" ২৪

এভাবে উপন্যাস ত্রয়ীর বয়ন্ন বিশ্লেষণ করে, কথকতা বিষয়ভাবনা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদের বৌদ্ধিক অবস্থান সম্পর্কে আমরা ধারণা করে নিতে পারি। উপন্যাসের সন্দর্ভ বা ডিস্‌কোর্সের গ্রন্থনায় প্রধান-অপ্রধান ধারাগুলির আন্তঃসম্পর্কও আভাসিত হয়েছে - আপাত-পৃথক উপলব্ধির ক্ষেত্রসমূহ যেভাবে পরস্পর-নিবিষ্ট হয়ে উপন্যাসত্রয়ী-তে স্থাপত্যের ঘনত্ব এনে দিয়েছে, তা বিস্ময়কর। একদিকে জীবনতত্ত্ব, সংগীত-তত্ত্ব, উপন্যাসতত্ত্বের, সংশ্লেষণ আর অন্যদিকে সমাজ-চেতনা, রাজনৈতিক বোধ ও মানবিক সম্পর্কের অনুভূতিবেদ্য

ব্যাখ্যা পাঠককে উপন্যাস ত্রয়ীর বহুযাত্রিকতা সম্পর্কে অবহিত করে তোলে। প্রথম জীবনে ধূর্জটিপ্রসাদ দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সমব্যথী ছিলেন না, স্ত্রী জাতির সামাজিক অসম্মানেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ডায়রিতে লিখেছেন -

> "মরে গেলে আবার যদি জন্মাতেই হয়, তবে মেয়ে না হয়ে জন্মানই ভালো। অত কষ্ট, অত অত্যাচার সহ্য হবে না।" [২৫]

কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমরা এই অত্যাচারের কোনো প্রতিকারের নির্দেশ পাইনি। বরং বলা যায় তিনি স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি। তাঁর বিচারে -

> "এঁদের বয়স হলেও কথাবার্তায় একটু ছেলেমানুষী।" [২৬]

এই অবজ্ঞা আরো প্রকট হয় যখন তিনি বলেন -

> "আমার জীবনে একটি মাত্র 'স্ত্রী' লোক দেখেছি - ইন্দিরা দেবী। নিতান্ত সংযত, ভাওবেন ত যচকাবেন না, অন্য স্ত্রীলোক মেয়ে-মানুষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ মাত্র।" [২৭]

প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায়, এতে লিঙ্গ বিভাজিত সমাজের পুরুষ-তান্ত্রিক মূল্যবোধ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ভারতীয় নারীর শান্ত ও সৌম্য ভাবমূর্তিকে বরণীয় মনে করেছেন এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথাও বলেছেন - কিন্তু নারীকে তিনি তুলনামূলকভাবে হেয় মনে করতেন বলেই মনে হয়। তেমনি জাতিভেদ প্রথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন। জাতিভেদ প্রথা যে একটি সামাজিক ব্যাধি এবং তার অবস্থান অত্যন্ত জরুরী - এ বিষয়টির প্রতি তিনি নীরব থেকে গেছেন। অর্থাৎ এতে বর্ণবিভাজিত বর্গবিভাজিত লিঙ্গ-বিভাজিত সমাজের বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধতাই প্রকট হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সময়ে তিনি শোষিত মানুষের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ঠিকই কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো পথের সন্ধান দেননি। সাম্যবাদের প্রতি তার বিশ্বাস বৌদ্ধিকতার আড়ম্বরে পিষ্ট হয়ে গেছে, এই বিশ্বাসের কোনো ক্রিয়ামূলক দিক ছিলো না। পাঠকের জিজ্ঞাসা তাই থেকেই যায় : মনে

প্রশ্ন জাগে ধূর্জটিপ্রসাদের 'আধুনিকতা' ও তবে কী প্রগতিশীলতার আবরণের আড়ালে রক্ষণশীলতা-প্রসূত দুর্মর পিছুটানই বড়ো হয়ে ওঠে ? এখানে কী ধূর্জটিপ্রসাদের পরাজয়। বুঝতে পারি এই পরাজয় কোনো ব্যক্তি-র একক পরাজয় নয়, এ আসলে ঔপনিবেশিক সমাজের প্রসাদপুষ্ট শ্রেণীবদ্ধ বুদ্ধিজীবীর প্রতীকী পরাজয়।

বস্তুত উপন্যাসের আখ্যান-বয়নে এবং চিত্রিত চরিত্রগুলিতে ধূর্জটিপ্রসাদের এই সুযাচিত নিয়তি অর্থাৎ আত্মসৃষ্ট এই পরাভবেরই শিল্পিত ভাষ্য ফুটে উঠেছে। এবার আমরা উপন্যাস-ত্রয়ীতে অভিব্যক্ত চরিত্রদের সানুপুঙখ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

খগেনবাবু

খগেনবাবু উপন্যাস-ত্রয়ীর নায়ক। তিনি একজন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী। জীবন-তত্ত্ব সন্ধানই তাঁর লক্ষ্য। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস নিজস্ব পথে ব্যক্ত হয়। তাই তিনি মাসীমার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও স্ত্রী সাবিত্রীদেবীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা রমলা দেবীর সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতে দিয়েছেন। সাবিত্রীও চাইতেন খগেনবাবু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে মেশেন. এবং সুখ্যাতি ও তারিফ করেন। তবে রমলাকে প্রথম দিকে তার ভালো লাগত না। রমলাদেবীর বিপক্ষে আকৃতি ছাড়া বোধ হয় অন্য আপত্তি ছিলোনা। তাকে দেখলেই খগেনবাবুর বুদ্ধি জাগ্রত হতো, কদমফুলের রোঁয়ার মতো, কিন্তু সাজসজ্জার উগ্রতা তাঁকে পীড়া দিতো। সাবিত্রী রমলার অনুকরণে সাজত বলে তাঁর আপত্তি। রমলার সম্পর্কে নিজেই মন্তব্য করেন -

> "ওঁর দেহগত কোন আকর্ষণ নেই আমার কাছে, ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব চলে। প্রেম চলে না, ওঁকে শ্রদ্ধা করা যায় দূরে থেকে, ওঁর জন্যে পাগল হওয়া যায় না"।[২৮]

রমলার চরিত্রে আছে পুরুষের সহজ শক্তি, স্ত্রীসুলভ খামখেয়াল নয়। খগেনবাবু ব্যক্তিগত জীবনে টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন, গান ভালোবাসতেন, ধ্রুপদ, ঠুংরি এগুলো শুনতেন, সমঝদারি ছিলেন।

ছেলেবেলায় খগেনবাবু, কলেজের কীর্তিমান ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগাজিন বার করা, থিয়েটার করা, ডিবেটিং ক্লাবে তর্ক করা ছাড়া বাকি সময়টা আড্ডা দিয়ে কাটাতেন। পড়াশুনা করতেন গভীর রাতে, বই-এর সঙ্গে ফাঁকি দেননি, মাঝে মাঝে থিয়েটার করতেন ও দেখতেন। বিলিতী কাগজ পড়া তার একটা প্রধান সখ ছিলো, সেই সঙ্গে প্রচুর চা ও সিগারেট খেতেন। কারও ভালো অভ্যাস গ্রহণ করতে খগেনবাবুর আপত্তি ছিলো না। সাবিত্রীর মৃত্যুর পর খগেনবাবু খুব একা হয়ে গেলেন।

> "মানুষ হল একলা, সজারুর মত সে থাকে গর্তের মধ্যে; গর্তের মুখে কত পাতা কত কুটো দিয়ে সে নানা রকমের বাধা সৃষ্টি করেছে, শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে। গর্তের মধ্যে সজারু থাকে শঙ্কিত চিত্তে, বাইরের হাওয়া প্রবেশ করল, ভেতরে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল, ঐ বুঝি এল।" [২১]

সাবিত্রীকে মেডিকেল কলেজ থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে পোড়ানো - সব কিছু রমলার পরিচিতরাই করেছিলো। সব শেষ হবার পর খগেনবাবু রমলার বাড়ীতে আসেন, এবং তাঁর পরিচর্যায় সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফেরেন। প্রথম-প্রথম তিনি রমলার পরিচর্যা পেতে চাইতেন না কিন্তু ক্রমশই তার জালে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। রমলা সাবিত্রীর শ্রাদ্ধের কথা পাড়াতে তিনি পরিস্কার জানান -

> " এদেশে এ সমাজে, এ যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের।" [৩০]

একধারে তিনি আদর্শের পরিপন্থী আবার স্বাভাবিকতারও প্রয়োজনীয়তা, স্বীকার করেন। তাঁর মতে বিধবারা যদি সাজতে পারত, তাহলে দুঃখবিলাস ও নিজের প্রতি অনুকম্পায় বিধবারা অমন অস্বাভাবিক হতেন না। খগেনবাবু সাবিত্রীর কাছ থেকে শিখেছিলেন বিবাহিত জীবনে মিথ্যার একটা বিশেষ স্থান আছে, তাতে আদর্শ স্বামীরা স্ত্রীদের ঠকান, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না। এই দেশে, ভদ্রতা ও মিষ্টতার মধ্যে জড়িয়ে থাকে মিথ্যা। ইগ্‌ড্র্যামিনের তলায় কাঠবিড়ালীর বাসা, ভদ্রতা হলো কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। খগেনবাবু মিথ্যা আচরণ একদম করতে পারেন না, তাই তিনি কলকাতা ছেড়ে পালাতে চান। তিনি মানুষের গুনটাকে ভালোবাসেন, মানুষটাকে নয়। অস্তিত্বকে মানা আর সহজে আপন হতে ভালো লাগা এক জিনিস নয়। যে ব্যক্তি সংযমী সেও একটা সত্য কিংবা মিথ্যা আদর্শ খাড়া করে সাধনা করে। আদর্শকে জেনে-শুনে বুকের মধ্যে নিলে কোনো কষ্ট হয় না। কাজের নেশা খগেনবাবুর আছে কিন্তু কোনোদিন কাজকে ছোঁননি, কাজের ভয়ে চিন্তাশীল হয়েছেন। তাঁর মতে, মেয়েরা কখনও চিন্তা করতে চায় না। তাঁরা সব কষ্ট সহ্য করতে চায়, এমন কি বারবার মা হতেও আপত্তি করে না কিংবা গভীর রাতে ভাঁড়ার ঘর থেকে স্বামীর সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই এনে দিলেও ভাববার অনুরোধ পালন করতে চায় না। স্ত্রী মারা যাবার পর খগেনবাবু রমলাদেবীর সেবা-যত্নে চলছেন। নিজের এই নির্ভরশীল মনোভঙ্গির পেছনে মানবিক যুক্তিও খুঁজেছেন। খগেনবাবু স্মৃতিজীবী, এটা মনে করে তিনি আনন্দ পান যে, এক সময় কলেজ স্কোয়ারের পাম লীগ গাছের তলায় ক্লাস শেষ হলে আড্ডা বসত, গান, আলোচনা, খোস গল্প, সবই হত, সেই দলের মধ্যে আবার ছোট গণ্ডী ছিলো, যার সঙ্গে যার ভাব ছিলো তার নাম জুড়ে দেওয়া হতো। একজন না এলে অন্য জনের সাথে আলাপ জমত। প্রায় রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত চা-খাওয়ারও সাথে সাথে চলত আড্ডা, পরে থিয়েটারের আখড়া দেওয়া, বাড়ি ফেরার পথে বই ও নোট নিয়ে চুপি-চুপি ঘরে প্রবেশ করা, তারপর পড়াশুনা চলত রাত দুটো পর্যন্ত। সূর্য উঠত সাড়ে আটটায়, এগারটায় কলেজ, আবার আড্ডা, চা-এর দোকানে

অনেক বিল হত, হাসিয়া বিনা আপত্তিতে টাকা দিতেন। এই স্মৃতিচারণায় ব্যক্তি-খগেনবাবুর ব্যক্তি-ত্ব নয়, তাঁর বর্গগত পরিচয়ই বড়ো হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, ঐ যুগের সার্থক জীবন এক প্রকার বৈরাগ্য-সাধন, তার মূলে থাকা চাই একরোখামি, গোঁড়ামি, শুদ্ধতা-সন্ধান। খগেনবাবুর লক্ষ্য জীবনতত্ত্ব আবিষ্কার, তবু বুদ্ধিজীবীর ধরণ অনুযায়ী তিনি সংশয়বাদী, তাঁর বিশ্বাস, এখন আর বিজ্ঞান বিশদ জ্ঞান নয়, বিশেষজ্ঞের ষড়যন্ত্র। তাই বৈদগ্ধ্যের পরিবর্তে দম্ভ প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধেও তিনি জিজ্ঞাসু। তিনি মনে করেছেন অন্যের উপর আঘাত না হেনে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করাটাই হলো ধর্ম। আগেকার দিনে নিষ্কাম ধর্মটাও ভয়ঙ্কর ছিলো, সেই আমলে ব্রাহ্মনেরা ছিলেন প্রকৃতই নিষ্কাম ধার্মিক, বর্তমানে বিশেষজ্ঞেরা, যেমন নিষ্কামভাবে বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিক, দুইই মানুষের অন্যায়ের পরিপন্থী। সেবাশ্রমগুলিও এই দোষে দুষ্ট। খগেনবাবু একবার কলেজে পড়বার সময় এক স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দেন। সারাদিন পরিশ্রম করবার পর এক বাড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে গ্রামের লোকজন সাহায্যের জন্য এসে উপস্থিত হলে খগেনবাবু প্রচন্ড রেগে যান, এই শুনে একজন বাসীয়ার বয়সী মহিলা বলেন -

> "বাবা তোমরা যদি এদের মানুষ না ভাব, তাহলে এদের উপকার করতে এলে কেন ?" ৩১

মানুষ ছাড়া নিষ্কাম ধর্মও হয় না। সাবিত্রীর সঙ্গে খগেনবাবু দীর্ঘ দিন বসবাস করেছেন কিন্তু খগেনবাবু এই ভেবে বিমুগ্ধ যে স্ত্রী তাঁকে একান্ত করে দেখেননি। সুখের উপাদান হিসেবে তাঁকে ব্যবহার করেছেন। খগেনবাবুর ব্যক্তিত্ব স্পষ্টতই আলাদা, তাঁর ইতিহাস পৃথক, তাঁর শিক্ষা রুচি, আশা-ভরসা সবই নিজস্ব পথ ধরে চলে। তাঁর মতে সমাজের নিয়ম হলো ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে দিয়ে আদর্শ স্বামী হয়ে উঠতে হবে। অন্যদিকে সাবিত্রী ও রমলা সমশ্রেণী-ভুক্ত নয়। খগেনবাবুর মতে সাবিত্রী যান্ত্রিক।

একদিন সাবিত্রী কীর্তন শুনে কেঁদেছিলেন, এটা খগেনবাবুর ভালো লাগে নি। তাঁর মতে, উপভোগ কি চোখের পেছনের গন্ড থেকে গড়িয়ে পড়ে - উপভোগ মাথায়, বুদ্ধিতে, মনে।

সাবিত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে কলকাতা খগেনবাবুর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। নিজেকে রমলার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য তিনি কাশীতে রওয়ানা হলেন। আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে খগেনবাবু বলেছেন -

> "আমার জগৎ কোথায় জানেন ? এই মস্তিষ্কের মধ্যে। আমার বাইরে কি আছে জানি না, তার একটা মোটা নাম দিয়েছি, সাধারণ মানুষ, জনগণ। ভিড়ের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে। বোঝাতে পারলাম কিনা জানিনা।" ৩২

কাশীতে গিয়ে খগেনবাবু সংসারত্যাগী হবেন এমন নয়, তাঁর অনেক বন্ধু আশ্রমবাসী হয়েছেন - তাদের কাছে চিঠি লেখা ইত্যাদি কাজের মধ্যে নিয়োজিত থাকবেন। কিন্তু রমলার ইচ্ছা, খগেনবাবু সামাজিক প্রবৃত্তিগুলোকে বশে এনে আত্মজ্ঞানী রূপে প্রতীয়মান হন। খগেনবাবুর মতে বন্ধুত্ব মাতৃস্নেহের চেয়ে বড়ো। একটি সন্তান মারা যাবার পর আর একটি সন্তান পেলে মা পূর্বের সন্তানের কথা ভুলে যায়, নতুন সন্তানের উপর মায়া পড়ে। কিন্তু বন্ধু মারা গেলে, নতুন বন্ধু পাওয়া যায় না।

> "বন্ধুত্বটা প্রেমের চেয়ে বড় মনে হয়।" ৩৩

খগেনবাবু জানেন,

> 'যে মানুষ সে নিজের উপর দাবি করে, নিজের কাছে চায়, যে সাধারণ সে চায় পরের কাছে। সেই জন্য অবলম্বন-হীনতাই যোগ্যতার কঠিনতম পরীক্ষা।" ৩৪

তাঁর মতে মেয়েরা সর্বদাই গতানুগতিক রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক, এইজন্য এরা ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারে না। খগেনবাবুর অন্যতম অভ্যাস হলো বিষয়ের গভীরে গিয়ে দার্শনিক

সমস্যাটি প্রকাশ করা :

"প্রবাহ অন্তঃশীলা, ওপরে বুদ্‌বুদ্‌ তারই নাম ভাষা, হাসি, চাউনি।" [৩৫]

তিনি মনে করেন, ভাগ্যের দ্বারা মেয়েরা চালিত। তাই বারে বারেই তাদের জীবনে পরিবর্তনের রেখা চোখে পড়ে। খগেন বাবু নিয়ম ভঙ্গ করতে চান না, কিন্তু নিয়ম যে তৈরি করে তাকে মানতে তিনি নারাজ। মেয়েদের তুলনামূলক দুর্বলতার কারণ সন্ধান করে তিনি জানান, ওঁরা বিধানকে মূর্তিমান করতে চায় বলেই ভাগ্যদেবতার উপর নির্ভর করে, খগেনবাবুর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কারও দ্বারা তিনি উপকৃত হতে চান না এবং কাউকে উপকারও করতে চান না। আর এই কারণেই তাঁর সভা-সমিতি, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, আশ্রম - কোন কিছুই ভালো লাগে না। তাঁর মতে, যতই উপকারের যাত্রা বাড়বে, ততই অক্ষমতা প্রকাশিত হবে।

"আমি স্বাধীন ব্যবসার পক্ষপাতী, Infant industry argument - এক্ষেত্রে অচল।"[৩৬]

কাশীতে আসার প্রায় এক সপ্তাহ পর খগেনবাবু রমলাকে চিঠি লেখেন। কাশীতে এসে দেখেন মাসীমা বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছেন। তাঁর চোখের জ্যোতি কমে গিয়েছে। পূর্বের শ্রী আর নেই। এই কম জ্যোতির সাহায্যে পাড়ার কারুর না কারুর নাতি-পুতির জন্য কাঁথা সেলাই করে দিচ্ছেন। খগেনবাবুর কাছে 'কাঁথা' শব্দটি ভীষণ কানে বাজে, কেননা এর দ্বারা ভারতবর্ষের দৈন্য প্রকাশিত হয়। কাঁথা মানেই বছর-বছর সন্তান প্রসব, শিশু-মৃত্যু, অনশন, অনটন যা তিনি সর্বদাই ঘৃণা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেও বুদ্ধিজীবীর অবস্থানটি স্পষ্ট। তাঁর কখনও খাপছাড়া করে উপন্যাস পড়তে ইচ্ছা হয় না এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়বার সময় কেউ কোলাহল করলে রাগ হয়। তাঁর মতে, মেয়েরা নভেল পড়ে দুপুরে ঘুম আনার জন্য। নভেলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে পরিচালিত করে। এখানে লেখকের প্রতিকল্প চরিত্র হিসেবে খগেনবাবু উপন্যাসতত্ত্ব-সন্ধানী। প্রতিটি

চিঠিতে খগেনবাবু নিজের মনের কথাই বলেছেন। রমলার সান্নিধ্য পাবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন -

> "আপনার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হয় - কতদিন যেন কারুর মনের পরিচয় পাইনি।" ৩৭

চিঠির মধ্য দিয়ে নিজের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন -

> "আপনার পাশে থেকে সানাই শুনলে সুর বেশি উপভোগ করতাম।" ৩৮

রমলাদেবীও খগেনবাবুকে পেতে চান। এইভাবে যখন পত্রালাপ চলে, ঠিক সেই সময় খগেনবাবু অসুস্থ অবস্থায় কাশী ছেড়ে হরিদ্বার আশ্রমে চলে গেলেন। আর শেষ চিঠি লিখলেন -

> " আমাকে পরীক্ষা করতে দিন। যেদিন উত্তীর্ণ হব, পুরুষ হব, সেই দিন নিজেই আপনার দ্বারে উপস্থিত হব।" ৩৯

খগেনবাবু সম্পর্কে বিশ্লেষণী মন্তব্য আমরা উপন্যাসেই পাই -

> "খগেনবাবুর চিন্তাগুলো সব এগিয়ে চলছে, জীবনের সঙ্গে তিনি সমগ্রভাবে চিন্তা করেন, দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে। চিন্তা-ব্যবসায়ীর মতন নয়, মস্তিষ্ক তাঁর সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত।" ৪০

বিজনের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় বিজন যদি হয় তরাই নদী তবে খগেনবাবু পাগলা ঝোরা। বাধা তাঁর অন্তরের, বাইরের নয়, অন্তরের বাধাই বড়। ডায়েরিতে খগেনবাবু লিখেছেন -

> "আমার বাসনা হল উন্মুখ। কাশীর রাতের ভোগ স্পৃহা আমাকে আক্রমণ করেছে। দিনের সাধনা, রাতের বাসনা, দিনের আদর্শ, রাতের বাস্তব,

আলোর বুদ্ধি, তমিস্রার দেহ - এই কি চিরন্তন বিরোধ ? বিরোধের অতিরিক্ত কি কিছুই নেই ? সামঞ্জস্য কি কেবল সাহিত্যের ভাষা ? এই দোলাতেই কি দুলব সারাক্ষণ ? সাধনা, আদর্শ, বুদ্ধির অত্যাচারে চিত্ত আমার জর্জরিত।" [৪১] অন্তরের এই বিরোধ সহ্য করতে না পেরে তিনি চেয়েছিলেন সাবিত্রীকে এই বিরোধের ভাগ দেবেন কিন্তু সাবিত্রী- তা নিতে চায়নি। রমলাদেবী তার এই বিরোধকে উপলব্ধি করেছিলেন তাই রমলাকে তাঁর ভালো লাগে।

আগেই দেখেছি ধর্ম সম্বন্ধে খগেনবাবুর চিন্তাভাবনা একটু অন্য রকম। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মানসিক বিচার-বুদ্ধির বিকাশকেই তিনি অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। বুদ্ধির দ্বারা একটা ঐক্যে পৌঁছতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্তরের সূত্র খুঁজে পাননি। তাঁর মতে যেটা ধারণ করে সেটাই ধর্ম, নিজের সুতোয় সাবিত্রীকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে বাঁধা পড়ল না। সুতো ছিঁড়ে গেল। তিনি প্রথমে সাবিত্রীকে নিজের অধীনে আনতে চেয়েছিলেন তার পর তাকে স্বাধীন করতেন নিজের চেয়ে বড়ো করে আদর্শকে বাইরে রেখে। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছেন যে আদর্শানুযায়ী ভালোবাসা অন্যায়। এর ফলে অন্যের জীবনের তার ছিঁড়ে যায়। আদর্শের কাঠামোতে মূর্তি গড়ায় একপ্রকারের কামনা প্রকাশিত হয়। তার পরিবর্তে যে যেরকম সেভাবে পেতে চাইলে সেটাই চূড়ান্ত পাওনা।

সাবিত্রীকে আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে বড় করতে গিয়েছিলেন বলেই সাবিত্রীকে হারালেন। কেননা মাপকাঠি দ্বারা মাপা যায় কিন্তু দীঘল করা যায় না। খগেনবাবু নিজের জীবনের মুহূর্তগুলিকে নর্তকীর লঘুপদে নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নৃত্যশিল্পের আদর্শ অনুযায়ী ছক তৈরি করার মধ্য দিয়েই তাদের সার্থকতা। এই ছক তৈরি করার নামই জীবন। এর মধ্যে রূপের ঐক্য নেই, নেই মালার সাযুজ্য। এমনকি সুরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়ে গেছে। ফলে খগেনবাবুর জীবনে দুটি ভাব সর্বদাই কাজ করে গেছে।

একটির গতি প্রবাহিত হয়েছে বিচ্ছিন্নতার দিকে অন্যটির গতি সম্পূর্ণতা ও ঐক্যের দিকে গেছে। শত চেষ্টাতেও তাদের মেলাতে পারছেন না। সাবিত্রী তাঁকে অনেকটাই সঙ্কুচিত করে দিতে চেয়েছিল, সে কেবল তাঁর স্বামী হয়ে থাকার মধ্যেই খুশী হত। এ-ব্যাপারে সমাজও তাকে সাহায্য করত। কিন্তু এই স্বামীত্বের বন্ধন থেকে একমাত্র বই-ই তাঁকে মুক্ত করেছে। তিনি ভাবেন, এই কর্ম-প্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হলেই হয়ত মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়। পুস্তের মতন তিনি নিজেকে বাইরের জীবন থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁরও শরীর খারাপ, এই অবস্থায় হরিদ্বার আশ্রমে গেলেন। কিন্তু আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী ভুলুর সেবা-যত্নে তিনি সেরে উঠলেন। তবে আশ্রমের কিছু ঘটনা তাঁকে ভীষণ ব্যথা দেয়। একদিন পূর্ববঙ্গীয় এক ভদ্রলোক মহারাজকে জানান যে তাদের কুলবধূ নিস্তারিনী দেবী পালিয়ে এই আশ্রমে এসেছে। নিস্তারিনী দেবী হলো আশ্রমের ভগিনী চন্দ্রাবলী, একজন পাচিকা। তাঁর সঙ্গে ভুলুর গোপন সম্পর্ক ছিলো, দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু একদিন এই সম্পর্কের ছেদ টেনে নিস্তারিনী দেবী পূর্বের সংসারে চলে যায়। এর পর তিনি আশ্রমে বসবাস করতে রাজী নন, পুনরায় কাশী চলে আসেন। কিন্তু তাঁর পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। রং তামার মতন, দেহ শীর্ণ, ঠোঁট চাপা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বেশভূষার পারিপাট্য নেই। মুকুন্দের কাছ থেকে তিনি রমলার কাশী আসার সংবাদ পান, এতদিন তিনি দেশভ্রমণ, সাধুসঙ্গ, কৃচ্ছ্রসাধন, ধ্যানধারণা ইত্যাদিতে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। কিন্তু এবার আর রমলার কাছ থেকে নিজেকে সরাতে পারেন না। রমলা কিছুতেই চায় না, তাঁর মন অন্য পথে পরিচালিত হোক। খগেনবাবু সময় চাইলে রমলা উত্তরে বলে -

> "কতদিন প্রতীক্ষা করব ! এতদিন ছিল সাবিত্রী, পরে এল আধ্যাত্মিক সাধনার সুদীর্ঘ অধ্যায়, মমতাহীন, অন্তহীন আদর্শের এ কী - অত্যাচার ? পরজন্ম মানিনা, আমি হিন্দু নই, স্ত্রী, সামান্য মেয়ে।" [৪২]

রমলা খগেনবাবুকে বলেন মনকে ফাঁকি দিয়ে আর কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই।

"মন চাইছে এক, আর বলছে অন্য। একে সত্য আচরণ বলে না।" ৪৩

খগেনবাবু নিজের সমালোচনায় বলছেন যে তিনি এতদিন ছিলেন আত্মম্ভরী মানুষ। এরই ফলে সাবিত্রীর মৃত্যু হয়েছিলো। আবার অহংজ্ঞান সর্বপ্রকার সাধনায় বাধা দিলো। ফলে পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেন কিন্তু মাসীমার তরফ থেকে বাধা আসে। মাসীমার মৃত্যুর পর আর এদের মিলনে বাধা রইল না। মোহানা-পর্বে এরা একত্রে বসবাস শুরু করেছেন। মুকুন্দ দেশে চলে গেল। সুজনেরও কোন খবর নেই, বিজন বাম-মার্গী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।

একত্রে বসবাসের ফলে খগেনবাবুর চিত্ত-বিক্ষোভ ঘটে। প্রথম প্রথম দেহ-সম্ভোগে অনীহা ছিলো না কিন্তু পরে অবসাদ এলো, সাহিত্যপাঠ শুরু করলেন। বোকাচ্চিও, পেট্রোনিয়াস বার্টন, কাসানোভা, বাৎস্যায়ন, কালিদাস ইত্যাদি সাহিত্যিকদের রচনা পড়তে লাগলেন। যখন বোদলেয়ার হাতে পেলেন এবং পড়লেন, তখন বুঝতে পারলেন যে সাধনার ফলে অমঙ্গল বিশ্বরূপ ধারণা করে সেটা চিত্তশুদ্ধিরই শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রক্রিয়া। পাপ ও পুণ্য - সম্ভোগ একই ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায়। বোদলেয়ারের এই সিদ্ধান্তের ফলে খগেনবাবু স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। দেহ ও মনের পার্থক্য ঘুচে যুগ্ম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো।

নৌকা বিলাসের মধ্য দিয়েই সন্ধ্যার প্রতিটি মুহূর্ত কাটত। বিকেল থেকেই চলত সাজসজ্জার প্রস্তুতি। রমলার এলোচুলে কখনও রঙ্গন, কখনও বেলীর মালা, ছোট ব্লাউজ কাঁধের ওপর তোলা, নানা রকমের শাড়ি এঁটে পরা, আঁচল ছোট কোরে রাখবার জন্য গড়নটা পাতলা দেখায়। অন্ধকার হয়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এরা কাশীর ঘাট পরিত্যাগ করতেন না। খগেনবাবু সারাক্ষণই রমলার জন্য ব্যস্ত, ফলে আদর বাড়ল,

নতুন নতুন শাড়ি এলো, মালী ফুল দিতে লাগল, বড় আয়নাও কেনা হলো, বিচিত্র পোশাকে রমলা নিজেকে সাজাত। কিন্তু কিছুদিন পরই কাশীর জীবনযাত্রা খগেনবাবুকে বিষিয়ে তুলল, তাঁরা আর কাশীতে থাকতে চাইলেন না। কাশীধাম পুরাতনের প্রতীক এবং মাসীমার স্মৃতিজড়িত, এখানকার বাতাসে রয়েছে সংস্কারের ছোঁয়া, গোটা শহরটা জুড়ে গঙ্গাবাসীর ঘর, হাল ফ্যাশানের বাংলোগুলোয় এক বছরের মধ্যেই ফাটল আর নোনা ধরে। স্বভাবতই কাশীর জীবন খগেনবাবুদের মধ্যে আনন্দের ফোয়ারা তুলতে পারল না, তাছাড়া পূর্বের মতো এরা সহবাসও করেন না। রমলার মধ্যে মাতৃত্বের যে আভাস দেখা দিয়েছিলো ডাক্তার তা উড়িয়ে দেয়; ফলে এঁদের মধ্যে দূরত্বের বোধ বেড়েই চলল। তাঁরা কাশী ছেড়ে কানপুরের দিকে রওনা হলেন। এলাহাবাদ স্টেশনে তাঁদের নামতে হলো, কেননা গাড়ি বদলাতে হবে, সেখানে তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের চিত্র দেখতে পেলেন। কানপুরেও একই চিত্র দেখলেন, শ্রমিকশ্রেণী ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ, মজদুর সভা নামে একটি সোসালিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেছে। বাড়ি খোঁজার সময় খগেনবাবু বিজনকে উদ্ধার করেন, বিজন মজদুর সভার সদস্য ফলে খগেনবাবুও আস্তে আস্তে ঐ সভার কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। খগেনবাবু নিজেকে যখন এ-ভাবে ব্যস্ত রাখছেন, রমলার প্রতি অবহেলা প্রকট হয়ে উঠলো। রমলাও ক্রমশ বিজনের সঙ্গে ক্লাবে যাতায়াত করতে লাগলেন। শেষে বাচ্চাদের স্কুলের ওয়েলফেয়ার সেক্শনের ভার নিলেন। এভাবে উভয়ই নিজেদের সমাজের স্বার্থে নিয়োগ করলেন।

সব মিলিয়ে খগেনবাবু একটি ভাবের প্রতিমূর্তিই হয়ে থাকেন, বুদ্ধিবাদের প্রখরতায় রক্ত-মাংসের শরীরী অস্তিত্ব যেন বাষ্পসা হয়ে গেছে। তিনি ভাবনা-সন্ধানী ভাবনার অনুগামী, ঘটনাও তাঁর কাছে ভাবনারই অভিব্যক্তি। ধূর্জটিপ্রসাদ ব্যক্তি-মানুষকে চিত্রিত করতে চান নি, ব্যক্তিত্বের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীর খণ্ডিত অস্তিত্বে আত্মবিরোধের অবসান হয় নি, মানুষের পূর্ণপরিচয়-বিষয়ক

জিজ্ঞাসা নিয়েও খগেনবাবু বায়বীয় হয়ে রইলেন। গন্তব্যের তুলনায় বহুশাখান্বিত পথরেখাই বড়ো হয়ে উঠলো।

রমলাদেবী

রমলা সংস্কারমুক্ত আধুনিক মহিলার প্রতিনিধি। লেখক জানান, মাসিক পত্রিকার মহিলা - প্রশস্তিতে তাঁর ফটোও বেরিয়েছিলো। তাঁর সাজসজ্জার প্রতি খগেনবাবুর যদিও প্রথম থেকেই অনীহা ছিলো, তবু তাঁকে দেখলে তাঁর বুদ্ধি জাগ্রত হতো : 'কদমফুলের রোঁয়ার মতো'। রমলার প্রতি তাঁর মনোভঙ্গি সাবিত্রীর কাছে এভাবে প্রকাশ করেছিলেন -

> "তোমার রমাদি স্ত্রীলোক নন পুরুষ, তাঁর দেহ ও মন বিপরীত ধর্মী, ওঁর দেহগত কোন আকর্ষণ নেই আমার কাছে, ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব চলে, প্রেম চলেনা, ওঁকে শ্রদ্ধা করা যায় দূর থেকে, ওঁর জন্য পাগল হওয়া যায় না। ওঁর আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটি মন্দ লাগে না, কিন্তু আধারের সঙ্গে আধেয়ের সম্বন্ধ নেই, সামঞ্জস্য নেই।" [৪৪]

খগেনবাবু রমলার চরিত্রে পুরুষশক্তির প্রভাব লক্ষ করেছেন, স্ত্রী সুলভ খামখেয়াল নয়। রমলার চরিত্রে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা খগেনবাবুর মধ্যে নেই, আর এই জন্যই তিনি রমলাকে প্রথম পর্যায়ে সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এই রমলাই খগেনবাবুর স্ত্রীর অপমৃত্যুতে সবরকম ভাবে সাহায্য করেছিলো। রমলাদেবীর সঙ্গে কেবলমাত্র মেয়ে মহলেই পরিচয় ছিলো তা নয়, সুজন, বিজন ইত্যাদি আরও অনেক পুরুষের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিলো। রমলা যে বহু পুরুষকেই মুগ্ধ করতে পারতেন তা খগেনবাবুর উক্তিতে জানা যায়। একবার রমলা দেবী টকটকে লাল শাড়ি পরে কলকাতা শহরে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই সাজে তাঁকে মন্দ দেখায় নি।

"শীতের পর নির্জলা দেশের দিগন্ত ব্যাপী মাঠে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে, তারই একটি লেলিহান শিখা যেন মূর্তি নিয়েছে।" [৪৫]

রমলা উচ্চশিক্ষিতা, বিলেত-ফেরত সমাজে তাঁর অগাধ মেলামেশা, পরবর্তীকালে তাঁর রুচিও মার্জিত হয়েছিলো। লেখক জানান, ইংরেজ মহিলা-উপন্যাসিক জেন অস্টিন পড়ে। অর্থাৎ ধূর্জটিপ্রসাদের চরিত্রনির্মিতি-পদ্ধতিতে সাম্প্রতিক উপন্যাসতত্ত্ব-প্রতিপাদিত 'অন্তর্বয়ন বা 'intertextuality' এর ছায়া লক্ষ করি। ঔপন্যাসিক রমলার স্বাতন্ত্র্যকে নানা অনুপুঙ্খের সাহায্যে স্পষ্ট করে তুলেছেন। খগেনবাবু একবার সাবিত্রীর জন্য ছোট একজোড়া দুল এনেছিলেন কিন্তু সাবিত্রীর মুখটা লম্বাটে ধরণের বলে ওটা মানাত না, তাই রমলা দেবীর পরামর্শে খগেনবাবুর ভাগ্নীর বিবাহে সাবিত্রী যৌতুক দিয়ে দেয়। উপন্যাস-পাঠে আমরা জানি, যদিও রমলার মুখটাও লম্বাটে ধরণের, প্রশ্ন তোলা হয়; তিনি কি করে পুরাতন গহনার স্বাদ বুঝবেন ? আরো জানানো হয় যে রমলা বোম্বে ওয়ালার দোকানের সঙ্গে পরিচিতা, স্বভাবতই তাঁর রুচিও বিদেশী, তবে তা বিদেশের মার্জিত রুচি নয়। শ্লেষগর্ভ ভঙ্গিতে লেখক জানান সে রুচিরও তারতম্য আছে এবং সংস্কৃতির প্রধান পরিবাহক শক্তি হিসেবে নারী সর্বদা বিশ্বাস্য নয়। বিকৃতরুচি নারীর মাধ্যমেই অন্দরমহলের খিড়কি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বৈঠকখানায় এবং বৈঠকখানার আবহাওয়াকে দূষিত করে। ধূর্জটি-প্রসাদের শ্লেষ অবারিত হয়ে ওঠে, যখন জানি, বিদেশের অনুকরণে নিজেকে না সাজালে স্বদেশী হওয়া যায় না, অথচ ইতিহাস বলে মেয়েদের জন্যই নাকি ভারতবর্ষের সভ্যতা অটুট রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ অনুযায়ী লেখক কিছুটা নারী-দ্বেষী অবস্থান থেকে জানান যে, রমলার মতো চপ কাটলেট খায়, পাউডার সেন্ট মাখে এবং পুরুষের মনোহরণ করে। এই তিক্ত শ্লেষ ক্রমশই তীক্ষ্ণতর হতে থাকে, পুরুষকেন্দ্রিক ভাষার গ্রহনায় ব্যক্তি-নারী আদর্শায়িত নারীপ্রতিমার ভারে পিষ্ট হতে থাকে। লেখকের ক্ষোভই ব্যক্ত হয় আখ্যানের আড়াল ভেদ করে : কটা মেয়ে এখন চন্দ্রকোণার শাড়ির নাম জানে, কটা

মেয়ে পুলিপিঠে, মোচার ঘন্ট রাঁধতে জানে ? রমলারা নিশ্চয়ই তা পারেন না। তেমনি তুলসীপাতার রসের বদলে মেয়েরা বিলিতি পেটেন্ট ওষুধ খাওয়ায় বলে লেখক অভিযোগের তর্জনী তুলে ধরেন। ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোয় চিরাগত সমাজ-সংগঠনের যে ভাঙন নারী-পুরুষের সম্পর্কেও ছায়াপাত করেছে - এই অমোঘ সত্য লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে পুরুষ বদলে গেলেও নারীত্বের দুর্বহ আদর্শায়িত বোঝা হালকা হয় নি, তাই নারীকে কাঠগড়ায় তুলে ধরা হয়।

খগেনবাবু কোথায় যেন কার কাছে শুনেছিলেন রমলাদেবীর স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই। তাই তিনি কলকাতায় একলা থাকেন। খগেনবাবুর চোখে সাবিত্রী ছিলো উৎসবমূর্তি, মন্দিরাভ্যন্তরে যে মূর্তি বিরাজ করত সেটি রমলাদেবীর। খাঁটি বিলিতি মেয়ে, অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, বিদ্যাসাগরের মতো ভুল করে এদেশে জন্মেছেন। রমলার সঙ্গে সাবিত্রীর তুলনা দিতে গিয়ে খগেনবাবু হরগৌরীর উদাহরণ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে রমলাই হর, কেননা তার মধ্যে পুরুষোচিত ভাব আছে। গৌরীর অন্য সব গুণ থাক আর না থাক বাপের বাড়ি যাবার আব্দারটি ছিলো। অন্যদিকে হরঠাকুরটি বেশ ভালো মানুষ, তার মধ্যে চিত্তের বৈকল্য, ভাবের উত্তাপ - এগুলির অভাব রয়েছে, তেমনি রাগ, কায - এগুলিও রয়েছে সেই সঙ্গে আছে চিন্তার প্রসারতা। একবার বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করে কি জব্দটাই না করেছিলেন! বেশ সহজ, সরল পুরুষ, একদিকে স্বামীকে আঁচলে বেঁধেও রাখেন, আবার স্বামীর অপমান হলে প্রতিবাদও করেন, তেমনি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াও করেন, এই বোধ হয় জীবন, তাছাড়া এটাই স্বাভাবিক এবং ভালো। হরগৌরীর জীবনে কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কোনো কিছুই ছিলো না, উভয়ই সহজ এবং সরল ছিলেন, তাই তো হর-গৌরীর জীবন, আদর্শ বিবাহিত জীবনের প্রতীক।

সঙ্কোচের জন্যই সাবিত্রী আত্মহত্যা করেছেন, আর তার বন্ধু রমলাদেবী খগেনবাবুকে সঙ্কোচশূন্য হতে বলেছেন। রমলাদেবী বুদ্ধির চাষ করতে চান না, কেননা বুদ্ধির চাষ দেহকে ঘৃণা করতে শেখায়। তিনি অবশ্যই সুগৃহিনী। ফ্যাশানের বিপক্ষে গিয়েই ফ্যাশান করতে ভালো বাসেন। এই ব্যাপারটি সাবিত্রী খুব ভালো রপ্ত করতে পারেনি। তাঁর মতে খদ্দর পরাটাই ফ্যাশান, শীতকালে খুব একটা অসুবিধা হয় না কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অচল। অবশ্য রমলা বলেন অন্য কথা যার যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে চলবে, তিনি নিজস্বতা বজায় রাখার পক্ষপাতি। দৈনন্দিন জীবনযাপনের অনুপুঙ্খও ধূর্জটিপ্রসাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। রমলা রাত্রে কিছু খান না, মোটা হবার ভয়ে। রোগা হবার পরিকল্পনাটিও কিন্তু বিদেশি। এ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে বিদেশের মেয়েরা রোগা হচ্ছেন, বাংলার পরিশীলিত বর্গের নারীরা এর অনুকরণে ব্যস্ত। খগেনবাবু রমলাকে বিদ্রূপ করে বলেছেন -

> "আপনার এই আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি-র কি প্রয়োজন থাকতে পারে আর কাউকে ?" [৪৬]

রমলার মতো নারীর কারও সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া দুষ্কর। খগেনবাবু বলেছেন -

> "বাঁকুড়া অঞ্চলের শ্মশানের এক বুড়ো বটগাছ, ধূ ধূ করছে মাঠ, তারই গুঁড়ির মধ্যে এক পাথরের দেবীমূর্তি, ঝুরিতে ঢেকে রেখেছে সূর্যের তাপ ও লোকচক্ষুর জনতা থেকে। গ্রামের লোকে ভূত চতুর্দশী কী অমনি কোন অন্ধকার রাত্রে মধ্যে মধ্যে পূজো দিতে আসে, সকলে নয়, নেশাখোর দল, তান্ত্রিক সাধু দু' একটি। মূর্তির শীতল করুণ হাসি পূজার প্রতীক্ষায় ফোটেনি। দিগন্তব্যাপী নীরবতা, বুড়ো-বটের সনাতনত্ব, জীবন-মৃত্যুর পারম্পর্য, উষর ভূমির নিষ্ফল অবকাশের সাথে মিতে পাতিয়েই দেবীর আত্মা সন্তুষ্ট। এ দেবীকে ফুল দেবার দরকার নেই, এর পূজারী নেই, তবু এই মূর্তি হাসে, সুখ-দুঃখের প্রতি গভীর ঔদাসীন্যে, পরিবর্তনের প্রতি চরম নিরপেক্ষতায় এই দেবী সস্মিতবদনী ও চিরকুমারী।" [৪৭]

সাবিত্রীকে দাহ করার কয়েকদিনের মধ্যেই রমলাদেবীর সঙ্গে খগেনবাবুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। রমলাদেবীর মা তাকে কার্যত বিক্রি করে দিয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় মার মুখে যে ক্ষমা-প্রার্থনার অনুচ্চারিত কাতরতা ফুটে উঠেছিলো, তা তাঁর নজরে পড়েছিলো। রমলার একটি ছেলে হয়েছিলো, কিন্তু বাঁচেনি, কম বয়সে মারা যায় অযত্নে। রমলা যে সম্পত্তির মালিক, তা তাঁর নিজস্ব, কিন্তু সাবিত্রীর সম্পত্তি তাঁর স্বামীর। কিন্তু উপন্যাস ত্রয়ীতে অন্তঃশায়ী নারীদ্বেষী সন্দর্ভ [illegible] অক্ষুণ্ন থেকেছে, ফলে সম্পত্তির উপর অধিকার চরিত্রনির্মিতিতে কোনো নতুনমাত্রা যোগ করেনি। লেখকের কণ্ঠস্বর আখ্যান-বয়নে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাই যখন লক্ষ করি : মেয়েদের স্মৃতি নেই, বন্ধুত্বের মধ্যে ভালো-মন্দ ভেদরেখা নেই, আছে শুধু নিয়তির লীলা। নিয়তির দ্বারা মেয়েরা পরিচালিত। স্বভাবতই তারা চিন্তায় বিশ্বাস করে না। রমলা এ সম্পর্কে যে-ধারণা পোষণ করেন, তা পুরুষ-তান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধ ও প্রকাশভঙ্গি দ্বারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ব্যক্তির ধর্ম তথা পুরুষের ধর্ম হলো পুরুষকার, এর তাৎপর্য হলো জ্ঞান ও চিন্তার সাহায্যে প্রতিবেশকে অতিক্রম করা। লেখকের প্রিয় বক্তব্যই ঘুরে ফিরে আসে যে মেয়েরা চিন্তা করতে চায় না, তারা চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। ধূর্জটি প্রসাদের তাত্ত্বিকতা অব্যাহত থাকে অন্তর্বয়ন হিসেবে; তাই প্রসঙ্গত তিনি উপন্যাস-তত্ত্বের অবতারনা করে মূল সন্দর্ভ [illegible]-এর মধ্যে কৌনিকতা যুক্ত করেন। পাঠক জানতে পারে, নারীই কর্ম বা গল্প খোঁজেন; কোনো পুরুষও যদি তা চান, তাহলে তাঁকে 'মেয়েলি পুরুষ' বলে ধরে নিতে হবে। এ ধরণের আত্যন্তিক অভিমতের উৎস যে লিঙ্গ বিভাজিত সমাজের যৌথ নিশ্চয়তায় অর্থাৎ প্রাক্-আধুনিক বিশ্ববীক্ষায় - এটা ভেবে আজকের পাঠক খানিকটা বিপন্নবোধ করেন কেননা তাতে লেখকের বুদ্ধিবাদের মধ্যে চরম এক-দেশদর্শিতার ইঙ্গিতই ফুটে ওঠে। লেখক ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়তি ও কর্মবিষয়ক বিশ্বাসকে নিজের মতো করে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর মতে কর্ম মানেই নিয়তির প্রতি স্বীকৃতি যেহেতু নিয়তি আছে বলেই কর্ম; এছাড়া সভ্য পৃথিবীতে শ্রম-বিভাজন পদ্ধতি চালু হওয়াতে কর্মের ছেদ নেই। এই সমস্ত কারণে নিরীহ ব্যক্তির জন্য প্রস্তাবিত নতুন জগৎ হলো চিন্তার

জগৎ। বিজ্ঞানও দর্শনের উদ্দেশ্য হলো নিষ্কাম চিন্তা। প্রসঙ্গত ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর উপন্যাস-তত্ত্বকে উত্থাপিত করেন - সত্যকার নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকে শুধু চিন্তাস্রোতের বিবরণ।

> খগেনবাবুর কাশী থেকে চলে যাওয়ার খবর জেনে রমলা যেন কেমন হয়ে গেলেন, "হাত কাঁপছিল, গলা আটকে গেল, রমলা দেবী বিছানায় বসে পড়লেন। শিশুরাই সন্ন্যাসী হতে চায়, সন্ন্যাসী হলে সাংসারিক নাম-ধাম কিছুই থাকে না - সন্ন্যাস এক বিরাট শূন্যতা; ডিফে করতে হয়, বিশ্রাম নেই। সারা দিন পায়ে হাঁটা, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই ... ।" [৪৮]

রমলার এই প্রতিক্রিয়াতে যেন তাঁর ঘোষিত নিয়মের বিরোধ দেখা দিচ্ছে।

> " হিন্দু বিবাহের আদর্শ কি বলুন ত ?' বিবাহের আর আদর্শ কি ? ও ত আদেশ, হিন্দু-বিবাহ বলে পৃথক কিছু আছে নাকি ? কে জানে । যেখানে মিলনের কোন আকাঙ্ক্ষাই নেই, মিলন অসম্ভব, তার নামই হিন্দু-বিবাহ।" [৪৯]

বিবাহ-সম্পর্কিত বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মনের গোপনে যে আক্ষেপ ছিলো তারই ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে যেন। তাঁর শিশু পুত্রের মৃত্যুর রাত্রেই রমলার প্রতিবাদী ভূমিকার শুরু। স্বামী তাঁকে গার্হস্থ্যবৃত্তে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলো লাঠি-হাতে চাপরাশি; কিন্তু রমলা আর তাঁকে স্বামীত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে চাননি। রমলা চলে এলেন,কলকাতায় সেই থেকে তাঁর একাকিত্বের শুরু। উপন্যাসে রমলাকে বুড়ো বটগাছের তলায় দেবীমূর্তি এবং একাকী, নিঃসঙ্গ, নির্ভীক ফুজিয়ামার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রমলা আশ্রমে যাননি; নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবনের তাৎপর্য ও পথ সন্ধান করেছেন। আবার রমলাতো শুধু তত্ত্বের মানবীরূপ নন, রক্ত-মাংসের বাস্তবতার বাইরেও নন, তাই তিনি এই একাকী জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। সেই পর্যায়ে খগেনবাবুর ভূমিকা যেন অনুঘটকের। আবার এখানেও লেখকের জীবনতত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের কাজই হলো প্রকৃতির নিয়ম অব্যাহত রাখা। তাই কাশীতে এসে রমলা নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না।

"আমার যেন মাথা খারাপ হয়েছে ... এই ছোট বৌদিকে দেখে। ওর কী স্বাস্থ্য ! স্বামীকে রাত ন'টার আগে ফিরিয়ে আনে, বলে কি জান ? সাধ্যি কি ! থাকুক দেখি একবার ন'টার পর ! মজাটি টের পাবেন না ? অথচ তোমার বেলাতেও আগ্রহ। ওর যেন কী একটা উপচে পড়ছে, কি সেটা বলত সুজন ? কেন আমার তা থাকবে না ? নয় কেন ? আমার কী অন্যায়টা হয়েছে ? বঞ্চিত হব কোন্ দোষে ?" [৫০]

সুজন রমলার পরিবর্তন লক্ষ করে বলে -

"এই ত কোলকাতায় ছিল নম্রতা, ভদ্রতা, আপন ভুলে পরের চিন্তা ! একি হল ! এই ক'দিন যে অপেক্ষা করতে পারে না সে কী করে সামনে রেখে নিজেকে সামলাবে ! কোথায় যেন ভব্যতার অভাব ঘটল, সংযম টুটল, সভ্যতার আবরণ খসল ।" [৫১]

খগেনবাবু কাশীতে ফিরে এলে এরই চরম প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। রমলা জানে স্বামীরা কী চায় এবং স্ত্রীরা কী দেয়। কিন্তু খগেনবাবু এর অতিরিক্ত কিছুর প্রত্যাশা করেন অথচ নিজেই জানেন না সেটা কী ? তারপর তাঁদের সম্পর্কে নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত। প্রাচুর্যটাই হলো কাল, প্রচন্ড ক্ষুধার নিবৃত্তির পরও যেন অতৃপ্তি থেকে গেলো। এই অতৃপ্তিকে পূরণ করবার জন্য বহির্জগতের সঙ্গে সেতু গড়ে তুলতে হলো।

এই পর্যায়ে রমলাকেন্দ্রিক সন্দর্ভে ..... এই বক্তব্য প্রকাশিত হলো যে সেই পুরোনো আমল থেকে মেয়েরা দিয়েই এলো, অন্যদিকে লোভ দেখিয়ে, আদর করে কখনো বা বালকসুলভ আচরণ করে, আবার কখনো বীরের পোশাক পরে পুরুষেরা খাজনা আদায় করেই গেলো। খানিকটা শ্লেষের ভঙ্গিতে পাঠককে এও জানানো হয় যে এতে মেয়েদের কোন আপত্তি নেই, এর জন্যই আসলে এরা ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকে। ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অসমতা চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে, মানবিক মূল্যে নারী যে পুরুষের সম-

গোত্রীয় হবে, তারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি দেখতে পাই সুজনের প্রতি রমলার আকর্ষণও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবেশিত হয়েছে। কোনো একরাত্রে সুজন ও রমলা অক্ষয়বাবুর একটি ঘরে সারারাত কাটিয়েছিলো। নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা এই বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হলো। রমলার আগাগোড়াই সুজন ও বিজনের সঙ্গে সুচ্ছন্দ ব্যবহারে কোনো আড়ষ্টতা নেই। বরং বুদ্ধিবাদের চর্চায় এঁরা পরস্পরের সহযোগী। আবার নরনারীর দেহচেতনাও তাঁদের চিন্তায় ছায়াপাত করে যদিও সকলের প্রতিক্রিয়া একই ছাঁচে ঢালা নয়। সুজনও রমলার একত্র রাত্রি যাপনের মধ্যে লেখকের নিরীক্ষাপ্রবণ মনোভঙ্গিই ফুটে উঠেছে; আর রমলার দেহচেতনা সত্ত্বেও কার্যত তিনি হয়ে ওঠেন ধূর্জটিপ্রসাদের তাত্ত্বিকতারই আধারমাত্র। মাসীমার মৃত্যুর পর খগেনবাবু ও রমলা একসঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। প্রথম-প্রথম বেশ আনন্দেই কেটে ছিলো কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাশীর জীবনযাত্রা বিষিয়ে উঠলো। উভয়ে কানপুরের দিকে যাত্রা করলেন। ধীরে ধীরে খগেনবাবুর মোহ কেটে গেলো। অবশ্য এর জন্য রমলা যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী খগেনবাবুর বুদ্ধিবাদী তত্ত্বসন্ধান। অন্যদিকে রমলার নারীসত্তা মাতৃত্ব সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলো। কিন্তু ব্যর্থ হওয়াতে রমলার মধ্যেও দেখা গেলো গুনগত পরিবর্তন। খগেন-বাবু শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন আর রমলাও সুজন ও বিজনকে পেয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম বিজনের সঙ্গে ক্লাবে যেতেন, সপ্তাহে একটি করে সিনেমাও দেখতেন, কিন্তু এর মধ্যে রমলা সুস্থির থেকেন না। উপন্যাস-ত্রয়ীর শেষে তাঁকে একটি শিশুদের স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে দেখতে পাই। অর্থাৎ খগেনবাবু যেমন বহিরঙ্গ বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হলেন, রমলার ক্ষেত্রেও একই পরিণতি হলো।

ধূর্জটিপ্রসাদ যেন বোঝাতে চেয়েছেন যে, অন্তর্বৃত জীবন নিয়ামক হলেও মানুষের অস্তিত্বের পূর্ণতার পক্ষে শেষ কথা নয়; দ্বন্দ্বময় জীবনের বহির্বৃত পরিধিতে নিজেকে যুক্ত করতে না পারলে বুদ্ধিবাদী আত্মসন্ধান মরীচিকায় পথ হারাবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে

পুরুষই নারীর অভিজ্ঞতার সীমারেখাকে নির্দেশ করে দেয়, তবু উপলব্ধিতে ধন্য নারী মনোলোকের কুয়াশা থেকে সূর্যতাপস্নাত বাস্তবে উত্তীর্ণ হয়েই নিরর্থকতা থেকে সার্থকতার সোপানে এসে দাঁড়ায়।

সাবিত্রী দেবী :

ধূর্জটিপ্রসাদ নারীস্বভাবের একটি ভিন্নবর্গের প্রতিনিধি হিসেবে খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীকে উপস্থাপিত করেছেন। সাবিত্রী ছিলেন সন্দেহপ্রবণ নারী। স্বভাবত আত্মশক্তিতেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন। বন্ধু জোটানোর আগে খগেনবাবুর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। বুদ্ধিবাদী স্বামীর বিপরীতে তিনি ছিলেন বেমানান, কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি বা মানবিক সম্পর্ককে হৃদয় দিয়ে বিচার করতেন, বুদ্ধি দিয়ে নয়। রমলার সঙ্গে বন্ধুত্ব তাই সাবিত্রীর জীবনে বিচিত্র তরঙ্গ তৈরি করেছে, কিন্তু এর বিভিন্নমুখী তাৎপর্যকে তিনি কখনো ঠিকমতো বিশ্লেষণ করে দেখেননি। অশান্তির জন্য খগেনবাবুও খানিকটা দায়ী, তিনি নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে নারীর সার্বিক স্বাতন্ত্র্যে নয়। প্রাচীনপন্থী মাসীমা সাবিত্রীর অবাধ মেলামেশায় ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে -

"শিক্ষা দিয়ে ভালবাসতে শেখে না, পরকে ভালোবাসাতে শেখায়।" [৫২]

সাবিত্রীও কোনোদিনই মাসীমাকে সহ্য করতে পারেননি। কেননা সাবিত্রীর ধারণা বোনপোর সঙ্গে দেওরঝির বিয়ে দিতে পারেননি বলে মাসীমার মনে একটা ক্ষোভ রয়েছে। তবে সাবিত্রীর বন্ধুদের মতে মাসীমার উচ্চশিক্ষা ছিলো না, ছিলো হৃদয়। হৃদয়ের শিক্ষা দিয়েই তিনি পরকে ভালোবেসে খুশি হতেন। সাবিত্রীকে মাসীমা আড়াল থেকেই ভালোবাসতেন। তাঁর কাজে তিনি বাধা দিতেন না। পাছে বউ-এর রূঢ় দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ে, সেই ভয়ে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কাশীতে চলে গেলেন। এখানেও ধূর্জটিপ্রসাদ পরিকল্পিত নারীর ভিন্ন-ভিন্ন রূপ আমরা লক্ষ করি। মাসীমার মতোমানুষদের স্বভাবই হলো নিজের সর্বস্ব দিয়ে অন্যকে খুশি করা। মাসীমার আদর্শায়িত চরিত্রের পাশাপাশি সাবিত্রী যেন বিরোধাত্মক অভিব্যক্তি অর্থাৎ

আদর্শহীন নিরালোক জগতের অধিবাসিনী। লেখক তাই দেখান, সাবিত্রী ও তাঁর বন্ধুদের পছন্দসই কাজ : দামী শাড়ি পরা, হাতকাটা ব্লাউজই তাঁদের বেশি পছন্দ - এই অনুচ্ছেদের মধ্যে পূর্বকথিত শ্লেষগর্ভ পুরুষতান্ত্রিক কথকতার সন্দর্ভই আভাসিত হয়েছে। এই তিক্ত বিদ্রূপ-বিম্ব সন্দর্ভই আরো প্রসারিত করে লেখক জানান, এই মেয়েদের চোখে সূর্যা থাকবে, পায়ে নাগরা। তাঁদের হৃদয় বলতে তো কিছুই নেই, হৃদয় থাকলেও তা হিংসায় পোরা, মাৎসর্যে ভর্তি।

সাবিত্রী চাইতেন, খগেনবাবু তাঁর বন্ধুদের অল্প-স্বল্প মিশেই তাঁদের তারিফ করেন ও সুখ্যাতি করে বেড়ান। সেই সঙ্গে সাবিত্রীকে তাঁদের সঙ্গে আরো বেশি করে মিশতে দেন। খগেনবাবু একবার সাবিত্রীর অপরিচিতা এক বন্ধুপত্নীকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যান, ফেরার সময় সাবিত্রীর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, সেই কথা সাবিত্রীরকানে যেতে খগেনবাবু বেজায় মুসকিলে পড়লেন। সাবিত্রী বলেছিলেন -

> "কৈ, কোন সমাজে কোন পুরুষ অন্যের স্ত্রীকে স্বামীর অবর্তমানে থিয়েটার, বায়স্কোপ পাশে বসিয়ে দেখাতে নিয়ে যায় ?"[৫৩]

সাবিত্রীর ভিন্ন সমাজ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখে খগেনবাবু চমৎকৃত হন - একথা কথক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ জানিয়েছেন। বস্তুত 'গভীর জ্ঞান' ও 'চমৎকৃত' শব্দগুলি পুরুষ-কেন্দ্রিক ভাষা-চেতনা ও বাচনিক প্রকরণেরই প্রমাণ বহন করে। সাবিত্রীর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যেও ধরা পড়ে যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধই সাবিত্রীর উচ্চারণে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বহিরঙ্গ সাজ-পোষাক অচলায়তনের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যকে চাপা দিতে পারেনি। আর এখানেই সাবিত্রী ও রমলাকে দুটি ভিন্ন মেরুর অবস্থানে পাঠক দেখতে পান।

সামান্য ব্যাপারেই সাবিত্রী ভেঙে পড়তেন। একবার গলার হার নিয়ে খগেনবাবুর সঙ্গে তাঁর লঙ্কাকাণ্ড বেধে গিয়েছিলো। হারটা পরলে সকলেই প্রশংসা করত। কেবল

খগেনবাবু ভালো বলেন না। তিনি বলেন -

"তোমাকে না প'রেই ভাল দেখায় কিনা, তাই বলি না।" [৫৪]

কিন্তু এর গূঢ় তাৎপর্য সাবিত্রীর বোধগম্য নয়। তাই সাবিত্রী অভিমান করে খুলতে গিয়ে হারের পিনটা খারাপ করে ফেলেন। সারাবার জন্য খগেনবাবু পরের দিন স্যাকরাকে পাঠান, কিন্তু পরে জানতে পারেন, রমলা নিজের পরিচিত দোকান থেকে হারটা সারিয়ে নিয়েছেন। খগেনবাবুর এতে অভিমান হবারই কথা কিন্তু সাবিত্রীই বলেন -

"পরের বৌ-এর গয়না ভেঙে গেলে সারিয়ে দাওগে যাও, নতুন গয়না গড়িয়ে দাওগে, আমার জন্য কোন কষ্ট করতে হবে না।" [৫৫]

একবার খগেনবাবু এক বন্ধুপত্নীর গয়না সারিয়ে দিয়েছিলেন, স্যাকরাটি রমলার আশ্রিত, ফলে পাঁচ কান হতে সময় লাগে নি। নতুন নতুন বই খগেনবাবু কিনে আনলেই সাবিত্রী নিজের ঘরে গুছিয়ে রাখতেন। কথক আরো যে সব অনুপুঙ্খকে তাৎপর্যবহ করে তুলেছেন, তা হলো এই যে সাবিত্রী কিছুতেই 'সবুজ-পত্র' পড়তেন না, বলতেন 'ঘরে-বাইরে' তো রয়েছে। আর রেকর্ডের বাক্সে সবই ছিলো বাংলা গান : যাদুদা, আঙুর বালা পান্না প্রমুখ গায়িকার কীর্তন শুনে সাবিত্রীর চোখে জল চলে আসত। মেজাজের দিক দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ছিলেন পুরোপুরি আলাদা। খগেনবাবুর ভালো লাগত ধ্রুপদ, খেয়াল ঠুংরী তেমনি সাবিত্রীর কীর্তন ভালো লাগতো। এ বিষয়ে কথক ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের কাছে যে ভাব-সূত্র উপস্থাপিত করেন, তা হলো - প্রথম-প্রথম সাবিত্রীর ব্যবহারের মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্তির প্রকাশ ছিলো, পরে এলো কুণ্ঠা। ধীরে ধীরে জীবন পরিশীলনের অন্তর্বৃত উত্তাপ কমে আসে, তখন অন্তরের সত্য ম্রিয়মান হয়, চারপাশে দেখা দেয় মিথ্যার অন্ধকার। এই সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্বে সাবিত্রী হারিয়ে গেছেন, কেননা এই আত্মবিরোধকে কাটিয়ে ওঠার মতো মানসিকতা সাবিত্রীর ছিলো না। কথকের মতে, তিনি ছিলেন ভিজে ত্বড়ি। তাই সাবিত্রী ফস করে জ্বলে উঠেই নিভে গেলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ নারী-ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। নিজস্ব ভাবকল্প অনুযায়ী জীবন-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন বলে একদিকে দেখিয়েছেন সাবিত্রী-রমলার বৈপরীত্য অন্যদিকে সাবিত্রী খগেনবাবুর দ্বিমেরু-বিষয়তায়। উপন্যাস-ত্রয়ীর বয়নে সাবিত্রী ,গানের ভাষায় বলা যায়, অবরোহী সুর বা Counter Point ; খগেনবাবু ও রমলাকে ঘিরে গড়ে-ওঠা আরোহী সুরের আকল্পকে পরিস্ফুট করার জন্যই তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছে। উপন্যাসে তিনি কথামুখ বা প্রস্তাবনা মাত্র, আখ্যানে প্রকৃত গতি সঞ্চারিত হয়েছে কথাবৃত্ত থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্ক্রমণের পরে। আর, এই মৃত্যু তো সরাসরি চিত্রিত হয় নি; খগেনবাবুর চিন্তার সূত্রেই সাবিত্রীর উপস্থাপনা।

সুজন

খগেনবাবু-রমলার সম্পর্ককে পরিস্ফুট করার জন্য যেমন সাবিত্রীকে চিত্রিত করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তেমনি ক্ষীণ কাহিনীর ধারাবাহিকতায় দ্বন্দ্ব-অভিঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে তিনি দুটি অনুঘটক চরিত্রের অবতারণা করেছেন - সুজন ও বিজন। সাংগীতিক কাঠামোর অনুসৃতির কথা যদি মনে রাখি, তাহলে সুজন ও বিজনকে বাদী সুরের পরি-পূরক সম্বাদী সুর হিসেবে বর্ণনা করা যায়। সুজন ও বিজন ধূর্জটিপ্রসাদের জীবন-তত্ত্বের দুটি অবতলের অভিব্যক্তি।

সুজনের চোখে-মুখে সর্বদাই সহজভাব প্রকাশ পায়। লেখক জানান, তার মধ্যে যে শীতলতা, বরফের কঠিন শৈত্য-প্রবাহ নয়। সে প্রতিটি মুহূর্তে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। পরের জন্য সে নিজের জীবনকেও সমর্পন করতে দ্বিধা করে না। তবে সে বড় চাপা, নিজের প্রয়োজন কখনো প্রকাশ করতে চায় না। আর এই স্বভাবের জন্যই রমলাদেবী সুজনকে

শ্রদ্ধা করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর চরিত্রগুলিকে শেক্সপীয়ার কথিত 'a local habitation and a same' দেওয়ার জন্যই যেন জানিয়েছেন, কলেজ স্ট্রীট থেকে একটি গলি সোজা চলে গেছে - তারই মধ্যে বিজন-সুজনের বাড়ি। দেখলে বোঝা যায় বেশ বড়ো বাড়ি, গাড়ি আছে, আছে দারোয়ান। এভাবে কৌশলে লেখক তাদের শ্রেণীগত পরিচয় পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন। বিভিন্ন অনুপুঙ্খের মাধ্যমে তাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধিও স্পষ্ট করে তোলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দা, তারই কোণে একটি সুসজ্জিত হল, ডাইনে-বাঁয়ে আরো দুটি বৈঠকখানা, ডাইনের ঘরটি বই-ঠাসা। এখানে তাদের বৌদ্ধিক অবস্থানের ইঙ্গিতও পাওয়া গেলো। এই ঘরের পেছনে, ভেতরের বাঁধানো উঠানের কাছাকাছি ঘরটি সুজনের। পর্দার ফাঁক দিয়ে দু-চারটে টবে সাজানো পাতাবাহার এবং গোল লোহার সিঁড়ি খানিকটা দেখা যায়। এই পারিপাট্যে তাদের জীবনের ছকটি ফুটে উঠেছে। লেখক জানান, বাড়িতে কোনো মহিলা নেই। ধ্রুপদী সঙ্গীতে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুর-সংগঠনের অনুপুঙ্খ দিয়ে তার অন্তর্নিহিত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়, তেমনি সুজন-বিজনের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করার জন্যে লেখক অনাবশ্যক বহিরঙ্গ অনুপুঙ্খের ধারাবাহিক সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সুজনের ঘরের আসবাবপত্রও যেন চেতনাপ্রবাহে রঞ্জিত হয়ে ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক হয়ে উঠেছে। সুজনের শয়ন-গৃহই তার পাঠকক্ষ - এতে আসবাব সন্নিবেশ এমনভাবে হয়েছে, যাতে সমস্ত কিছুই তাঁর ঐকান্তিক পাঠাভ্যাসের প্রতি তর্জনী সংকেত করে। তাই দেখি, লোহার খাটের পাশে একটা বাতি টেনে শিয়রের কাছে আনা হয়েছে। পড়বার টেবিলে বই রয়েছে, এছাড়া রিভলভিং সেলফেও বই আছে। বৈঠকখানার দরজার ফাঁকে বড় আলমারিও বইতে ঠাসা, এত বই-এর সমারোহ দেখে বোঝা যায় সুজনের পুস্তক-প্রীতি সাধারণত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে। লেখক জানান, তাঁর রুচি ভিন্ন স্বাদের, তাই নানা ধরনের বই দেখতে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশই মনোবিজ্ঞানের বই এছাড়া পদার্থবিজ্ঞান, সৌন্দর্যতত্ত্ব ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিদর্শন সংক্রান্ত একাধিক লেখকের বই আছে। প্রায় সব বই আধুনিক লেখকদের। এতে সুজনকেও জীবনতত্ত্ব-অনিসন্ধিৎসু-বুদ্ধিবাদী বলে চেনা যায়। লেখক আরো জানান, সুজন সাম্প্রতিক

তরুণদের মতো সফরী-সংকরণ করে না বা অধ্যবসায়েও সে অনিচ্ছুক নয়। যৌলিক বই না পড়লে মনের তৃষ্ণা মেটানো যায় না; এতে মনের আভিজাত্যও বজায় থাকে না।

খগেনবাবু অবশ্য এ-ধরণের মানসিকতাকে খুব একটা আমল দেন না। তাঁর মতে অ্যামেরিক্যানিজম সভ্যতার রিপু বিশেষ। গনতন্ত্র একাগ্রচিত্ততা ভেঙে দেয় - মনকেই অস্বীকার করে। লেখক জানান, সুজনের চরিত্রে যে ভারসাম্য লক্ষ করি তা স্থানু পদার্থের নয়, চলিষ্ণু জীবের। নিজেকে লুকিয়ে রাখা তার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার উপস্থিতিতে বিরোধের সমন্বয় হয়। সুজনের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কিন্তু আপনা হতেই তার উত্তর সে পেয়ে যায়। সুজন হলো বিজনের পিসতুতো ভাই, ছেলে বেলা থেকেই মামার কাছে মানুষ, তার বাবা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন, মাও মারা গেছেন। রমলাদেবী তার মাকে দেখেছেন - গোরার আনন্দময়ী যেন। সুজনকে তার মামা খুব ভালো বাসেন। বিজনই বাড়ির কর্তা, তার পরামর্শেই গৃহ-কর্ম চলে, বিজনেরও যা নেই কিন্তু সুজনের জন্যই শৃঙখলার অভাব হয় না। সুজন রমলাদেবীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, নিজে তা মানতে চায় না, কেননা সে জ্ঞানে বৃদ্ধ।

সুজন খগেনবাবুর সঙ্গে রমলাদেবীর মিলন ঘটানোর জন্য কাশীতে এসেছিলো। এখানে আসার পর তার চরিত্রে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। কলকাতায় আলস্য বলতে তার কিছু ছিলো না, ভোর-বেলায় উঠে চা-তৈরি করে খেতো এবং বিজনকেও দিত। সে অভ্যাসটি আর বজায় থাকলো না। তার যৌবনকালীন অধ্যবসায়ের ও নিয়মানুবর্তিতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে আলস্যকে সমর্থন করে এবং সামাজিক ইতিহাসে অবকাশের প্রয়োজনকে আবিষ্কার করে। চিরকাল ঘড়ি ধরে চলার অভ্যাসকেও সে তখন নির্বাসন দিয়েছে। কাশীতে সিগারেট খাওয়াও রুদ্ধ হয়ে গেছে। রমলাদেবীর সঙ্গে গল্প করে অনেক রাত অবধি কাটাতে চায়। অবশ্য নিজেকে কখনো হারিয়ে যেতে দেয় নি। এর প্রমাণ সে বহুক্ষেত্রেই দিয়েছে। একদিন অময় ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে রমলাদেবীর সঙ্গে একঘরে থেকেও কোনো অসদ আচরণ করেনি। এদিক

থেকে সে সংযত মনের পরিচয় দেয়। উপন্যাসে সুজনের উপস্থিতি সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের পরিচয় বহন করে। সেক্ষেত্রে

"সুজনের সমগ্র জীবনটাই মৈত্রী স্থাপনের সেতু স্বরূপ।" ৫৬

আসলে উপন্যাস ত্রয়ীতে তার ভূমিকা মূলত সন্দর্ভ প্রতি-সন্দর্ভের (discourse counter discourse) মধ্যবর্তী সেতু রচনার জন্যই পরিকল্পিত।

বিজন

বিজনও বড়োলোকের একমাত্র সন্তান। সে একজন বলিষ্ঠ যুবক। বয়সের তুলনায় একটু বেশি দীর্ঘকায়। টেনিস খেলতে খুব ভালোবাসে, ইন্টার মিডিয়েট আর্টস পড়ে। বেশ বুদ্ধিমান, যেমন খেলাধুলায় চৌখস, তেমনি পড়াশুনায়, অল্প পড়েই পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে। বিজন প্রাণময় জগতের বাসিন্দা, এখনও অপরিণত। সে ভাবে, স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানোর যৌবন-সুলভ অধিকার তার আছে। তার বাবা বাড়িতে থাকতে পারেন না বলে বিজনই গৃহকর্তা, তার অঙ্গুলি নির্দেশেই সংসার চলে। তার মা নেই কিন্তু সুজনের তৎপরতার জন্যে শৃঙ্খলার অভাব নেই। বিজনের বাবা সুজনকে খুব বিশ্বাস করেন, তাই সুজনকে বিজনের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিজন নিজেকে 'বোরোট্যা'র মতন তৈরি করতে চায়। জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে তার ধারণা ভিন্ন গোত্রের :

"কী ফুর্তি লোকটার, যেন elanvital রূপ নিয়েছে, আপ্পায়ার পয়েন্ট দিলে, মিলে না, দ্যাখ, কেমন বেরে ক্যাপে মামিয়েছে - সমগ্র ফ্রান্স তার দিকে তাকিয়ে আছে, ভ্রুক্ষেপ নেই, যেন ব্রাডম্যানের ভাই। রমাদি, একেই বলে যৌবন, একেই বলে প্রাণশক্তি।" ৫৭

বিজনের বাবা রমলার বাবার বাল্যবন্ধু, সেইসূত্রে বিজনের যাতায়াত রমলার কাছে। খগেনবাবু সম্মুখে বিজনের মন্তব্যে তার নিজস্ব জীবনাদর্শ ব্যক্ত হয়েছে :

"খগেনবাবুর মতন বুদ্ধিতে আমার কাজ নেই সুজনদা। কচকচানি প্যাঁচ কাটা আমার ধাতে বসে না। রস সব শুকিয়ে গেছে ভদ্রলোকের! যার স্ত্রী মরেছে মাত্র দুদিন আগে - বাপ কোরো তোমরা - সে কী করে তর্ক করে ! বলবে তোমরা, চিন্তা যাঁরা করেন তাঁদের স্বভাবই ঐ, ও-রকম thoughtful লোকের সংস্পর্শে নদীও শুকিয়ে যায়, সাবিত্রী দেবীত কোন্ ছার ! ... কিন্তু ও কীরকম চিন্তা, যার তাপে সব যুসড়ে পড়ে, নিজের রস, ভাবগুলো পর্যন্ত।" ৫৮

অর্থাৎ সুজনের তুলনায় বিজনের ব্যক্তিত্ব অন্য ধাঁচে গড়া - বিজন ও সুজন যুগ্মক হলেও এদের অন্যোন্য অস্তিত্ব রয়েছে যেন মিখায়েল বাখতিন কথিত 'সমান্তরালতা ও অপরতা'র (Simultaneity and otherness)এর দৃষ্টান্তমূলক সমাবেশ। খগেনবাবুর সঙ্গে সুজনের সত্তাগত ঐক্যসূত্র রয়েছে। সে কথা কম বলে, এবং জীবনকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে বিজন জীবনকে খেলাঘর মনে করে, তার প্রাণ ছুটেছে অবাধগতিতে, কোনো বাধা নেই তার; স্রোতের বিপরীতে সে প্রতিস্রোত রচনা করে, তাই অনবরত কথা বলে। উপন্যাসের শেষ পর্বে দেখতে পাই বিজন সোশিয়ালিস্ট হয়েছে। আবার সন্দর্ভের গভীর থেকে সমান্তরাল প্রতিসন্দর্ভ-ও তৈরি হয়ে যায়; যেমন :

"সোশিয়ালিজমের নামে কেমন একটা আতঙ্ক আসে, অজানা অনিশ্চিতের ভয়। আবার একটা মোহও আছে। সোশিয়ালিস্ট হোক গরীব গৃহস্থের সন্তান, যাদের বুকে অর্থবৈষম্য বিঁধেছে। মনে মনে যারা স্নব, যারা সমাজের উর্ধ্বতম শিখরে আরোহন করতে চায়, তারা যখন ভাবে অর্থ নেই বলেই পাচ্ছে না তখনই তারা পরাভবের ব্যাখ্যা করতে সাম্যবাদের আশ্রয় নেয় বিজন স্নব নয়, টেনিস খেললেই স্নব হয় না, পয়সার তার অভাব নেই, সে আদুরে ছেলে। সোশিয়ালিজম্ শোভা পায় সুজনের নিজের, তার মতন অবস্থার লোকের। বৈষম্য রয়েছে সর্বত্র, কিন্তু বৈষম্যবোধ আসে নিম্ন

শ্রেণীর যারা দলিত পিষ্ট, যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খেতে হয়।" [৫৯]

সেদিক থেকে বিজনের সোশিয়ালিজম বড়লোকের ছেলের খামখেয়াল বলেই কথক দেখিয়েছেন। তাঁর মতে এও এক ধরণের রোমান্টিসিজম্।

ধূর্জটিপ্রসাদ উপন্যাসের বয়নের মধ্যেই বিজন সম্পর্কে সমালোচনাত্মক প্রতি-সন্দর্ভ তৈরি করেন। অন্য চরিত্রের চোখ দিয়েও পাঠক তাকে দেখতে পান," এই পদ্ধতি অবশ্য অন্যদের ক্ষেত্রেও সক্রিয় রয়েছে। তবে বিজনের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য এই যে এতে লেখকের জীবনাদর্শ ও সমাজ সংগঠনের ভাবাদর্শও বিশ্লেষিত হয়েছে। বিজন ও সুজনের চিঠি বিনিময় থেকে আমরা জানতে পারি যে বিজন টেনিস খেলায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলো এবং একই সঙ্গে তার বিশ্বাস, ধর্মের পথে দেশের সর্বনাশ কেননা

" এ-যুগে মেটিরিয়ালিস্ট না হলে চলবে না।" [৬০]

সুজন বিজনের হস্তলিপির সরলরেখায় তার অপরিণত সরলতার ইঙ্গিত পায় এবং ভাবে যে মতবাদের বিশ্বাস আসলে তার মানসিক দুর্বলতারই প্রমাণ," বিজন সম্পর্কে সুজনের বিশ্লেষণ এরকম -

> "আত্মপ্রচারের ভেতর দিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে। আগে নিজত্ব আছে স্বীকার করুক, তারপর সন্ধান চলবে। খগেনবাবুকে বিজনের ভালো লাগে না যে তার কারণ বিজন এখনো নিম্নস্তরের। সময়ের স্তর, সুভাবের নয়। অপরিণত যে ব্যক্তি সে কখনও পরিণতির পন্থার দুর্গমতা কল্পনা করতে পারে না, সংশয়ীর বিরোধকে হৃদয়াঙ্গম করতে পারে না।" [৬১]

বিজনকে সুজন চিঠিতে খানিকটা তির্যক ভঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সমাজবাদের মিলের কথা জানায়। সেই সঙ্গে তর্কের প্রতি ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রতি বিজনের মানসিকতাকেও গোপন শ্লেষের দ্বারা স্পষ্ট করে তোলে, ইঙ্গিতে জানায় যে সমস্ত ধরণের সংস্কার-মুক্ত

হওয়ার চেষ্টায় বিজন হয়তো নতুন সংস্কারে বদ্ধ হতে যাচ্ছে এবং তাতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কোনো স্থান নেই।

বিজন অবশ্য কাশীতে এসে সুজনকে জানায় যে অকারণ তর্কে তার কোনো উৎসাহ নেই এবং পণ্ডিত হওয়ার জন্য বই পড়াতেও তার আগ্রহ নেই। বিবাহ সম্পর্কে বিজনের ধ্যানধারণায় খানিকটা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বছায়া লক্ষ করি :

" কলকাতার যুগে স্ত্রী জাতটা নিজে রোজগার করছে, এবং আরো করবে। সে এখন দাসী নয়। স্বামীরও দাবি সেজন্য কমতে বাধ্য, স্ত্রীও স্বামীকে আঁচলের চাবি করে ঝুলোতে পারবে না; স্ত্রী জাতি আর অবলা নয়।" ৬২

সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নারী কর্মীদের সম্পর্কে বিজন যখন তার অভিজ্ঞতার কথা বলে, আমরা তার দৃষ্টিভঙ্গির স্বতন্ত্রতার প্রমাণ পাই। অক্ষয় যখন সুজনের কাছে বিজন সম্পর্কে বিদ্রূপবিদ্ধ মন্তব্য করে, তাতেও বৃত্তবন্দি মানুষের তুলনায় তার স্বতন্ত্র অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'আবর্ত্ত' উপন্যাসের শেষে বিজনের মনে নানা ধরনের প্রশ্নের আবর্ত তৈরি হয় কিন্তু উপন্যাসত্রয়ীর 'মোহানা' পড়লে তাতে নতুন কোনো মাত্রা যুক্ত হয় না। এই পর্বে সুজনের বদলে বিজনই খানিকটা প্রাধান্য পায়, কেননা ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনাদর্শ, সমাজভাবনা তার মধ্য দিয়েই যথাযথ ভাবে ব্যক্ত হতে পারে। এই পর্বে বিজনের বক্তব্য -

" সাধনা হল কাজ। চিন্তা কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।" ৬৩

এই পর্বে রমলা সম্পর্কে মানসিক বিরূপতা কেটে গেছে; বরং বিজন ক্রমশ রমলার কাছাকাছি এসেছে। কথক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ মন্তব্য করেন -

" বিজন রমলাকে বেশ গ্রহণ করে নিল। কখনও বিজনের কাছে সামাজিক প্রথার অর্থ ছিল না। তাই তার পক্ষে সহজ হল। বিজন প্রত্যাশা করছে যে সেই পুরাতন রমলাকেই সে কবে পাবে, রমলাও ভাবছে যে বিজন যা ছিল তাই আছে। দুজনের

পরিবর্তন যদি একই হয় তবে পরস্পরের চেষ্টায় সম্বন্ধ সমৃদ্ধতর হবে, নচেৎ পুরাতন সম্বন্ধের জোরে বিজন রমলার কক্ষে গৃহের মতন ঘুরবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নাগপাশ থেকে উদ্ধার নেই।" ৬৪

সুজনের সঙ্গে প্রতিতুলনায় বলা যায়, বিজনের ব্যক্তিত্বে লেখক সূক্ষ্ম পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন। সুজনের চিন্তার জগতের প্রতিস্পর্ধি বিজনের সামাজিক কর্মের জগৎ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধূর্জটিপ্রসাদ দেখান যে কোনো জগতই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয় - সমস্তই দ্বিধা, সংশয় ও আত্মবিরোধিতায় কণ্টকিত। রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনে খগেনবাবুর যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়, কথক হিসেবে লেখক তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন -

"ধ্যানীর শান্তিবচন আর নির্যাতিতের পুঞ্জীভূত অসূয়া একই বৃত্তাভাসের বিন্দুপথ।" ৬৫

আর, এই বৃত্তাভাসের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠক বিজনকেও চিনে নেয়। সমাজ পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েও মেয়েদের সম্পর্কে বিজনের ধারণা খুব একটা পাল্টায়নি। খগেনবাবুকে বিজন কথা-প্রসঙ্গে বলে যে মেয়েরা " শ্রেণী নয় খগেনবাবু, ওরা ডিন্ন জাতি ।" ৬৬ নিজের জীবনের বিবর্তন সম্পর্কেও সে সচেতন -

"আমি সুজনদার মত বই পড়িনি, ছেলেবেলা টেনিস খেলেছি, মোটর চড়েছি, রমাদির আদর খেয়েছি, কিন্তু কানপুর আমাকে নতুন করেছে, ভেঙে চুরে গড়েছে। ভাবি, আজ যদি ওস্তাদের সঙ্গ না পেতাম, তবে সাউথক্লাবের সভ্য হয়েই জীবনটা কাটত।" ৬৭

কিন্তু 'নতুন কর্মপ্রবাহে জীবন' কাটাতে গিয়ে বিজন কেবলই হোঁচট্ খায়, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খানিকটা অপরিণত এবং শেষ পর্যন্ত সফীককেও সে ভুল বুঝতে শুরু করে। খগেনবাবুর জবানীতে ধূর্জটিপ্রসাদ জানান -

"চরিত্র মানে অন্য কিছু নয়, যে বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তারই চরিত্র আছে, অন্যরা জড়ো, খায় দায় ঘুমোয় মরে, তারা মানুষ নয়।" ৬৮

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিজনকে লেখক যেন পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখাতে চান নি। খগেনবাবু যেমন চান -

'জীবনের প্রতি আচার ব্যবহার কর্ম ইচ্ছা প্রেরণা পদ্ধতিতে বুদ্ধির আলো পড়ুক।" ৬৯

-স্পষ্টতই বিজন তেমন নয়। শেষ পর্যন্ত বিজন সম্পর্কে সফীকের চমৎকার বিশ্লেষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে -

"এটা ভাবের খেলা নয় বিজন। তোমার শক্তিতে ইয়ুটোপিয়ার রচনা হয়, কিন্তু জগদ্দল পাথর এক চুল সরান যায় না। কে বলেছে তোমার বিশ্বাস ছিল না ? কিন্তু বিশ্বাসে এই স্বার্থের পাহাড় টলাবে ! ইডিয়টিক ! জোর নিজে অচল থাকা যায়।" ৭০

সফীক এবং বিজনের মতান্তর বস্তুত শ্রমিক নেতা ও সুপুদশী রোমান্টিকেরই স্বাভাবিক বিরোধিতার ফসল। বিজন সফীককে বলে 'পিয়র সোশিয়ালিস্ট' এবং জানায় -

"দেশের নেতৃত্ব যদি মধ্যবিত্তের হয় তবে বোঝা-পড়া ছাড়া গতি নেই"। ৭১

কথা কাটাকাটি থেকে কথা কাটাকাটি চরমে পৌছায় যখন সফীক সরাসরি অভিযোগ করে যে বিজন 'বিশ্বাস ঘাতক' কেননা সে পুলিশে খবর দিয়েছে আর বিজন সফীককে বলে 'খুনী'। এই সূত্রেই তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় অনুগত সফীকের ভাবনার সূত্রে আমরা জানি যে বিজন আসলে একটি শ্রেণী - মানসিকতার প্রতিনিধি -

" মার্কস বলে গেছেন সেই কতকাল পূর্বে যে মধ্যবিত্তের দু'ভাগ, একভাগ ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্যভাগ সহানুভূতি দেখায়, চাঁদা দেয়, অবশেষে তারাই রক্ষণশীলের দলে যেশে, ধর্মের ছুতোয়, ব্যবহারিক যুক্তির অছিলায়, বস্তুত স্বার্থের তাড়নায়, অজানার ভয়ে। তাদের নিজের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করাই ভাল।" [৭২]

প্রকৃতপক্ষে বিজন শেষে নিজের সীমাবদ্ধ সামাজিক অস্তিত্বের গণ্ডীতেই ঢুকে গেছে, নতুন মোটর, পার্টি ইত্যাদিতে ক্রমশ সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। সে তখন সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের কঠিন সমালোচক -

"এরা নিজেদের কল বানিয়েছে মজুরদের হয়ে লড়তে গিয়ে ... যেটা শত্রু তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে তাই হয়ে গেল ... মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের উপকার করবে। তা কখনও সম্ভব।" [৭৩]

এই কথায় খগেনবাবু যে প্রশ্নোত্তর করেন তাতেই বিজন সম্পর্কে শেষ কথাটি বলা হয়ে যায় -

"বিজন, বদলেছ তুমি, কিংবা হয়ত, যা ছিলে তাইতে ফিরেছ, পিছলে গিয়ে।" [৭৪]

এভাবে বিজন নিজস্ব বৃত্ত থেকে আকাশ-পরিক্রমায় বেরিয়ে অবধারিত ভাবে বৃত্তেই ফিরে আসে।

উপন্যাস ত্রয়ীর বিভিন্ন চরিত্রের আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে প্রতিটি প্রধান-অপ্রধান চরিত্রই ভিন্ন অস্তিত্বের অবভাস তৈরি করে মাত্র। আসলে এরা প্রত্যেকেই ঔপন্যাসিকের জীবনতত্ত্বের প্রতিনিধি এবং প্রচারক। তাই স্বামী-স্ত্রী বা নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ক যে তত্ত্ব খগেনবাবু ও সাবিত্রী কিংবা খগেনবাবু ও রমলার মধ্যে ব্যক্ত হয় -

দেখা যায় যে, সৃজন-বিজনের মধ্যেই একই আত্মিকতার প্রসার ঘটেছে। আসলে ধূর্জটিপ্রসাদ ঔপনিবেশিক সমাজের প্রসাদপুষ্ট শ্রেণীবদ্ধ বুদ্ধিজীবীর জীবনদর্শনকেই উপন্যাস ত্রয়ীতে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। নিজস্ব ভাবকল্প অনুযায়ী জীবনতত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন বলেই একদিকে দেখিয়েছেন সাবিত্রী-রমলার বৈপরীত্য অন্যদিকে খগেনবাবুর কেন্দ্রহীন পরিক্রমা। উপন্যাসে আমরা আরো যে-সমস্ত অপ্রধান চরিত্র দেখতে পাই যেমন - মাসীমা, মুকুন্দ, অক্ষয়, সফীফ, কিষণচাঁদ, করিম, উধামজী-এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে অন্তর্বয়নের অনুপুঙ্খ হিসেবে সক্রিয় থেকেছে। মূল কাঠামোকে পরিস্ফুট করার জন্যই এদের অস্তিত্ব পরিকল্পিত।

উল্লেখপঞ্জী :

১। G.Lukaes: The Meaning of contemporary Realism, Merlin Press, London, 1979 (1963), p.19.

২। রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত: উপন্যাস প্রসঙ্গে, কলকাতা, পৃ.৪০

৩। Ralph Fox ; The Novel and the People, Reprinted - 1970 Edition, p.26.

৪। Pavel Korin : On Realism (From Socialist Realism in Literature & Art). p.94.

৫। হিরণকুমার সান্যাল : পরিচয়ের কুড়ি বছর, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অখকাব্য জিজ্ঞাসা' - নায়ক প্রবন্ধের সমালোচনা ও ধনঞ্জয় দাশ, মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ.৬ থেকে উদ্ধৃত

৬। তদেব, পৃ.৭

৭। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), 'ঝিলিমিলি' দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭, পৃ.২৪২

৮। আনতোনিও গ্রামশি: বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা, অনুবাদ সৌরীণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ.৯

৯। প্রাগুক্ত, 'অন্তঃশীলা' পৃ.১১৫-১৬।

১০। তদেব, পৃ.১৩৫

১১। তদেব, পৃ.১৪১

১২। তদেব, পৃ.১৪৫-৪৬

১৩। তদেব, পৃ.১৪৭-৪৮

১৪। তদেব, পৃ•১৫১

১৫। প্রাগুক্ত, 'আবর্ত', পৃ•১২৯-২০০

১৬। তদেব, পৃ•২৩৫-৩৬

১৭। তদেব, পৃ•২৩৭

১৮। তদেব, পৃ•২৫৭

১৯। তদেব, পৃ•২৬৩

২০। তদেব, পৃ•২৬৫

২১। তদেব, পৃ•২৬৫

২২। প্রাগুক্ত, 'মোহানা', পৃ•১৪৯

২৩। তদেব, পৃ•৮৬

২৪। তদেব, পৃ•১২২

২৫। প্রাগুক্ত, 'ঝিলিমিলি' - পৃ•২২৭

২৬। তদেব, পৃ•২২৭

২৭। তদেব, পৃ•২৫১

২৮। প্রাগুক্ত, 'অন্তঃশীলা' - পৃ•৩

২৯। তদেব, পৃ•৭

৩০। তদেব, পৃ•১৩

৩১। তদেব, পৃ•৪৩-৪৪

৩২। তদেব, পৃ•৬৯

৩৩। তদেব, পৃ•৭২

৩৪। তদেব, পৃ•৭৩

৩৫। তদেব, পৃ•৮১

৩৬। তদেব, পৃ·১০০

৩৭। তদেব, পৃ·১১৪

৩৮। তদেব, পৃ·১১৫

৩৯। তদেব, পৃ·১২০

৪০। তদেব, পৃ·১৩০

৪১। তদেব, পৃ·১৩৪

৪২। তদেব, পৃ·২৮৩

৪৩। তদেব, পৃ·২৮০

৪৪। তদেব, পৃ·৩

৪৫। তদেব, পৃ·৪

৪৬। তদেব, পৃ·৬৫

৪৭। তদেব, পৃ·৬৫

৪৮। তদেব, পৃ·১২০-২১

৪৯। তদেব, পৃ·১২৫

৫০। প্রাগুক্ত, 'আবর্ত' - পৃ·১৯৩

৫১। তদেব, পৃ·১৯৪

৫২। প্রাগুক্ত 'অন্তঃশীলা' - পৃ·২

৫৩। তদেব, পৃ·৬

৫৪। তদেব, পৃ·১১

৫৫। তদেব, পৃ·১১

৫৬। প্রাগুক্ত, 'আবর্ত', পৃ·২৯৯

৫৭। প্রাগুক্ত, 'অন্তঃশীলা', পৃ·১২২

৫৮। তদেব, পৃ· ১৩০

৫৯। প্রাগুক্ত, 'আবর্ত', পৃ·১২৯-২০০

৬০। তদেব, পৃ·১৯৮

৬১। তদেব, পৃ·১৯৯

৬২। তদেব, পৃ·২৩৬

৬৩। প্রাগুক্ত, 'মোহানা' পৃ·৩২

৬৪। তদেব, পৃ·৩৪

৬৫। তদেব, পৃ·৩৯

৬৬। তদেব, পৃ·৬৩

৬৭। তদেব, পৃ·৬৫

৬৮। তদেব, পৃ·৮২

৬৯। তদেব, পৃ·৮২

৭০। তদেব, পৃ·১৩০

৭১। তদেব, পৃ·১৩১

৭২। তদেব, পৃ·১৩১-১৩২

৭৩। তদেব, পৃ·১৪৫

৭৪। তদেব, পৃ·১৪৫